ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পবিষয়ক

অ্যাডভোকেসি নির্দেশিকা

নীতি গবেষণা কেন্দ্র

ও

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পবিষয়ক অ্যাডভোকেসি নির্দেশিকা

বিষয়সূচি

প্রথম অধ্যায় : সাধারণ আলোচনা

১.০ ভূমিকা
১.১ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পবিষয়ক প্রাথমিক ধারণা
১.২ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ে কী বলা হয়েছে?
১.৩ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?
১.৪ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সামগ্রিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উদ্দেশ্যকে মেলানো
১.৫ অ্যাডভোকেসিবিষয়ক প্রাথমিক ধারণা

দ্বিতীয় অধ্যায় : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং অ্যাডভোকেসি

২.০ ভূমিকা
২.১ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অ্যাডভোকেসি কেন প্রয়োজন?
২.২ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অ্যাডভোকেসির সুফল
২.৩ মহিলা উদ্যোক্তা সম্পর্কে শিল্প নীতি ২০০৫-এ কী বলা হয়েছে?

তৃতীয় অধ্যায় : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অ্যাডভোকেসির ধাপ

৩.০ ভূমিকা
৩.১ ইস্যু নির্বাচন করা
৩.২ ইস্যু বিশে্লষণ করা
৩.৩ অডিয়েন্স চিহ্নিত করা
৩.৪ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা
৩.৫ সরকারি আইনের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা
৩.৬ নির্দিষ্ট কোনো সহায়তা কাজের মূল্যায়ন করা
৩.৭ সমস্যা নির্দেশ করা

চতুর্থ অধ্যায় : বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি

৪.০ ভূমিকা
৪.১ কৌশল নির্ধারণ করা
৪.২ টুলস নির্বাচন করা
৪.৩ বাজেট তৈরি করা
৪.৪ অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইনের পরিকল্পনা তৈরি করা
৪.৫ অ্যাডভোকেসি মনিটরিং ও মূল্যায়ন

পঞ্চম অধ্যায় : মিডিয়া অ্যাডভোকেসি

৫.০ ভূমিকা
৫.১ পদ্ধতি নির্ধারণ করা
৫.২ পরিকল্পনা তৈরি করা
৫.৩ কৌশল চূড়ান্ত করা
৫.৪ টুলস নির্বাচন করা

ষষ্ঠ অধ্যায় : কোয়ালিশন, নেটওয়ার্ক ও কৌশলগত পার্টনার

৬.০ ভূমিকা
৬.১ কোয়ালিশন
৬.২ নেটওয়ার্ক
৬.৩ কৌশলগত পার্টনার

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পবিষয়ক অ্যাডভোকেসি নির্দেশিকা

সম্পাদনায়:

শেখ তৌফিক এম. হক

মোহাম্মদ শের মাহমুদ

মোহাম্মদ আলী আহসান

সাখাওয়াৎ আনসারী

মোহম্মদ আবদুস সালাম

প্রকাশক: নীতি গবেষণা কেন্দ্র ও প্রাকটিক্যাল অ্যাকশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল:

যোগাযোগ:

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সূচনা ও বিকাশ মূলত জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা অর্জনের চাহিদা থেকেই। এদেশের শিক্ষিত এবং স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আয় রোজগারের প্রচলিত পথগুলোতে প্রবেশ করতে না পেরে নিতান্তই প্রয়োজনের তাগিদে এসব শিল্প গড়ে তোলে। এই শিল্পগুলোর উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়া এবং সেই সঙ্গে উদ্যোক্তাদের আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া— এই দুই কারণে ধীরে ধীরে এই ক্ষেত্রটি বাড়তে থাকে। বিভিন্ন স্তরের এবং ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন নারী ও পুরুষ এসব কাজে আগ্রহী হয়ে উঠে।

এসব শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তার বিষয়টি ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এসব ব্যাপারে যুক্ত হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ধীরে ধীরে বাড়তে থাকায় এবং এর সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যুক্ত হওয়ার ফলে এই শিল্পের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং বিকাশের ক্ষেত্রটি যেমন তৈরি হয়, তেমনই বিভিন্ন পর্যায়ে নানা সমস্যারও সৃষ্টি হয়। এই শিল্প বিষয়ে সরকারের নীতিমালা একদিকে যেমন অপ্রতুল, অন্যদিকে বিদ্যমান নীতিগুলোর সঠিক বাস্তবায়নও হচ্ছে না। এসকল বিষয় বিবেচনায় রেখে এই শিল্প বিষয়ক সরকারি নীতির বাস্তবায়ন, সংস্কার ও নতুন নীতি তৈরিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং তাদের প্রভাবিত করতে প্রয়োজন নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণে একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা। এই আন্দোলনে এমনসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করতে হবে যারা নীতিনির্ধারক এবং প্রশাসক পর্যায়কে কার্যকরভাবে উদ্বুদ্ধ এবং প্রভাবিত করতে সক্ষম।

এই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই নীতি গবেষণা কেন্দ্র এবং প্রাকটিক্যাল অ্যাকশন-এর যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হলো— *ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পবিষয়ক অ্যাডভোকেসি নির্দেশিকা।* ফরিদপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, এনজিও কর্মী, উন্নয়ন কর্মী এবং সম্পর্কিত সরকারি ও অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিন দফা আলোচনা ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এই নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া অ্যাডভোকেসি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পবিষয়ক বিভিন্ন ধারণা, বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োজন এবং করণীয় সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য সম্পর্কিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যমান বই-পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এই অ্যাডভোকেসি নির্দেশিকা তৈরিতে যাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে আন্তরিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হচ্ছেন— জনাব আব্দুর রব, জনাব শোয়েব সাজ্জাদ খান এবং জনাব সাখাওয়াৎ আনসারী।

সবশেষে আশা করছি যে, এই অ্যাডভোকেসি নির্দেশিকার সঠিক ব্যবহারে এদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানে কিছুটা হলেও অগ্রগতি হবে। এটি সম্ভব হলে আমাদের এই শ্রমও হবে সার্থক।

মাহবুবুল হক
পরিচালক
নীতি গবেষণা কেন্দ্র

বীণা খালেক
কান্ট্রি ডিরেক্টর
প্রাকটিক্যাল অ্যাকশন বাংলাদেশ

এই অধ্যায়ে যা আছে

অ্যাডভোকেসি সম্পর্কে সাধারণ আলোাচনায় অ্যাডভোকেসির সংজ্ঞা, লক্ষ্য, ক্ষেত্র, ধরন, বৈশিষ্ট্য এবং এর প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পবিষয়ক দেশি-বিদেশি ধারণা এবং এর ব্যাপ্তি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ আলোচনা

১.০ ভূমিকা

এই বিশ্বে শত শত কোটি মানুষ সর্বদা পরিশ্রম করছে, কাজ করছে । এই কাজ পরিচালিত হচ্ছে প্রথমত জীবন ধারনের যা না হলেই নয় সেই উপকরণ গুলো নিশ্চিত করার জন্য এবং দ্বিতীয়ত জীবনযাপনের প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত এবং সমৃদ্ধ করার জন্য। একটি অংশ চেষ্টা করছে তাদের মৌলিক অধিকারগুলো যথাযথভাবে আদায় করতে। আবার দ্বিতীয় একটি অংশ, যাদের মৌলিক অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা রয়েছে, চেষ্টা করে যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয় যেমন— সুশাসন, মানবাধিকার, পরিবেশ রক্ষা প্রভৃতি নিশ্চিত করতে।

এই পর্যায়ে আমাদের সামনে প্রশ্ন এসে যায়— এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপুলো কী হবে, এগুলো নিশ্চিত হবার পর তা স্থায়িত্ব পাবে কি না, কিংবা এই কার্যক্রমের ব্যাপ্তি কতটুকু হবে ?

প্রথম প্রশ্নটি সরাসরি প্রয়োজনগুলো পূরণ করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয় প্রশ্নটি এসেছে অতি প্রয়োজনীয় এবং বহুল ব্যবহৃত ‘টেকসই’ ধারণা থেকে। আজকাল প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য বা ভবিষ্যৎ সাফল্যের স্থায়ীত্বের বিষয়টি বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে। তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর দু’ভাবে দেওয়া যেতে পারে প্রথমত একটি রাষ্ট্র কিংবা একটি সমাজের বিবেচনায় এই কার্যক্রম কোন পর্যায় থেকে এবং কোন পর্যায় পর্যন্ত ব্যাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয়ত পুরো পৃথিবীকে বিবেচনায় নিলে এর ভৌগোলিক ব্যাপ্তি কতটুকু হবে— তা নির্ধারন করা।

এসব প্রশ্ন এবং প্রাসঙ্গিক আরো কিছু বিষয়কে বিবেচনা করে বর্তমানে যে পদ্ধতি বা পথটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে তা হলো ‘অ্যাডভোকেসি’।

বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা বা দাবি আদায়ের জন্য যা যা দরকার তার কয়েকটি হচ্ছে— বঞ্চিত মানুষদের দলবদ্ধ হওয়া, যারা নীতি তৈরি করছে তাদের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়ানো, সফলতাকে আরো বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এসব কিছু করার জন্য যে প্রক্রিয়াটি সারা পৃথিবী জুড়ে স্বীকৃত তা-ই ‘অ্যাডভোকেসি’।

১.১ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পবিষয়ক প্রাথমিক ধারণা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মোটামুটি ধারণা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে বাংলাদেশ সরকারের শিল্প নীতি ২০০৫- এর দিকে তাকাতে হয়। এই প্রসঙ্গে তিনটি ধারা উলে্লখের দাবি রাখে:

ধারা ৪.৪— ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শিল্পের সংজ্ঞা :

খ. "মাঝারি শিল্প" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি কারখানা ভবন ব্যতিরেকে অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য/প্রতিস্থাপন ব্যয় ১.৫০ কোটি টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা।

গ. "ক্ষুদ্র শিল্প" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য/প্রতিস্থাপন ব্যয় অনধিক ১.৫০ কোটি টাকা।

ঘ. "কুটির শিল্প" বলতে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পূর্ণ অথবা খন্ডকালীন সময়ে উৎপাদন অথবা সেবামূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত।

ধারা ৪.৫— নন-ম্যানুফ্যাকচারিং (ট্রেডিং সেবা এবং অন্যান্য সেবা) খাতে শিল্পের সংজ্ঞা :

খ. "মাঝারি শিল্প" বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে ২৫ হতে ১০০ জন শ্রমিক কাজ করে ।

গ. "ক্ষুদ্র শিল্প" বলতে বুঝাবে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে ২৫ জনেরও কম শ্রমিক কাজ কওে (কুটির শিল্পর মত পরিবারের লোকজন নয়)।

ধারা ৮ — ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ধারণা:

ধারা ৮.১— উন্নত ও উন্নয়ন বিশ্বে সুষ্ঠু শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসএমই'র বিকাশ ও সম্প্রসারণ বর্তমানে অতীব গুর“ত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে। শিল্পোন্নত দেশের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে এসএমই'র ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য এবং এ ধারাও বর্তমানে অব্যাহত রয়েছে। বিনিয়োগ, সঞ্চয়, মুনাফা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, রপ্তানি, আঞ্চলিক শিল্পায়ন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই'র ভূমিকা অত্যন্ড় গুর“ত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের আওতায় এসএমই'র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশকে অগ্রবর্তী সংযোগ (ফরওয়ার্ড লিংকেজ), পশ্চাৎমুখী সংযোগ (ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ), মূল্য সংযোজন কর্মকান্ড এবং উৎপাদনশীলতার গতি ত্বরান্বিত করা একান্ড়ভাবে অপরিহার্য । এ লক্ষ্যে শিল্পনীতি ২০০৫-এ এসএমই সেক্টরকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে প্র্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

ধারা ৮.২— বাংলাদেশের শিল্পের কাঠামোগত বিন্যাসে দেখা যায় যে, পাট, বস্ত্র, কাগজ, ইস্পাত ও প্রকৌশল, সিমেন্ট, ক্যামিক্যালস, সার ও ঔষধ কারখানাসমূহ বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের আওতাভুক্ত। আবার বিশেষায়িত বস্ত্র শিল্প (গার্মেন্টসসহ), গার্মেন্টস শিল্পের পশ্চদসংযোগ শিল্প, হস্ড়চালিত ওয়েল্ডিং, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাদ্য সংযোগ শিল্প, চামড়া, সিরামিক, অটোমোবাইলসহ হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং, মৌলিক মেটাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্ষুদ্রায়তন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, রাবার শিল্প, পেপার প্রিন্টিং ও পাবলিশিং শিল্প, স্মল ফেব্রিকেশন শিল্প, নন মেটাল মিনারেল প্রডাক্টস, ব্যাটারী, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেক্টনিকস, হস্ড়শিল্প, কৃষিভিত্তিক শিল্প, বহুমূখী পাটশিল্পজাত পণ্য, সিল্ক শিল্প, ফ্রুট প্রসেসিং, পোল্ট্রি ফার্মিং, ফিসারিজ, টি- গার্ডেনিং এবং প্রসেসিং, ভেজিটেবল সিড ফার্মিং, ফ্লোরিকালচার, এগ্রোফরেস্ট্রি এবং সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিজ এর আওতাভুক্ত শিল্পসমূহ যেমন— মুদ্রণশিল্প, গিনিং এন্ড বেলিং, নির্মাণ শিল্প, ট্রান্সপোর্টেশন (অটোমোবাইলসহ), চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী, কোল্ড স্টোরেজ, কম্পিউটার শিল্প, ফাস্ট ফুড ও ফ্রোজেন ফুড ইত্যাদি এবং আরও বহুক্ষেত্রই এসএমই'র আওতাভুক্ত।

ধারা ৮.৩— দেশে দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস এবং অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী অধিকহারে এসএমই প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ লক্ষ্যে সরকার দেশব্যাপী এসএমই প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও কৌশলগত সহায়তা প্রদানের জন্য একটি পৃথক এসএমই নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যেগ গ্রহন করেছে। দেশব্যাপী বিভিন্ন ধরণের এসএমই শিল্প প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ক্ষেত্রে এসএমই সংক্রান্ত নীতিমালায় সন্নিবেশিত যাবতীয় দিকনির্দেশনা ও কৌশল এসএমই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতে:
কর্মচারী ০ (শূন্য) হলে সেটা আত্মকর্মসংস্থান, ২ থেকে ৯ জন হলে, তা অতিক্ষুদ্র ব্যবসা, ১০ থেকে ৪৯ জন হলে তা ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং ৫০ থেকে ২৪৯ জন হলে তা মাঝারি ব্যবসা।

১.২ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ে কী বলা হয়েছে?

১.২.০ *ঋণসহায়ক নীতি*

বাংলাদেশে বিনিয়োগকারীকে ঋণ পেতে অনেক বাধা পেরোতে এবং উচ্চ হারে সূদ দিতে হয়। এই পরিস্থিতিতে সরকার সামগ্রিকভাবে অর্থখাতকে উন্নত করার লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। ঋণ খাতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানাধীন সেক্টরের পর্যাপ্ত ঋণ দেওয়া ও তা ফেরত নেওয়া নিশ্চিত করা। তাছাড়া ঋণের বহুল ব্যবহার রয়েছে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নানা জটিলতার কারণে জরুরি ভিত্তিতে ঋণ পাওয়ার সুযোগ থাকে কম। এক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান তৈরি করার প্রয়োজন আছে। এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বড় আকারে স্থানীয় এবং বৈদেশিক মাধ্যম থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বিনিয়োগের জন্য ঋণ দেওয়ার পরিবেশ তৈরি করা। সরকারকে এই প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন এবং পূর্ণ পেশাদারিত্বের নিশ্চয়তা দিতে হবে। এই নতুন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার এবং ঋণ শোধের খরচ কমানো নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন উদ্দীপনা এবং বিশেষ বিবেচনা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করাতে হবে।

১.২.১ *ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোগে সহায়তা দেওয়া*

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভিন্ন দেশের শিল্প বিকাশে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চার ভাগের তিন ভাগ শ্রমিকের কাজ জোটে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই একই পরিস্থিতি, বেশিরভাগ উদ্যোক্তাই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থেকে আসা। কিন্তু এগুলোতে শ্রমিক বেশি, অথচ পুঁজি কম। বাংলাদেশে সস্তা শ্রমের সুবিধা এবং পুঁজির অভাবের বিপরীতমুখীতা বিদ্যমান । ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রাধান্য এবং এই শিল্পের সফলতা নিশ্চিত করে যে, প্রক্রিয়াজাতকরণ সেক্টরের ব্যর্থতা বা অসহযোগিতা এর সংযোগ ঘটায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্বার্থকতায়।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রবৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। এই শিল্পের বিকাশ বিপুল পরিমাণে কাজের সুযোগ নিশ্চিত করছে, দেশজুড়ে যা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া এর মাধ্যমে নারী শ্রমিকদেরও ব্যাপক কাজের সুযোগ তৈরী হচ্ছে।

যেভাবেই হোক তুলনামূলকভাবে ছোট আকারের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলো প্রায়ই বিপদের মধ্যে পড়ে যায়। তাদের পক্ষে তেমন কোনো নীতি নেই যা তারা চায় যেমনটি আছে বড় শিল্পের পক্ষে। এদের এই বিপদাপন্ন অবস্থা প্রায়ই দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। যারা এবিষয়ক নীতি তৈরি করেন তারা প্রায়ই তাঁদেরকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়। জাতীয় উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত জরুরি এবং একই সঙ্গে এই শিল্পের পক্ষে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করাও উচিত যা এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে।

১.২.২ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সাধারণ সমস্যা

ক. নীতি নির্ধারণবিষয়ক

খ. অবকাঠামোবিষয়ক

গ. স্বচ্ছ জবাবদিহিতার অভাববিষয়ক

নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নানা পদক্ষেপ যা ব্যক্তিমালিকানাধীন বিনিয়োগে নানা সমস্যা তৈরি করে তা দূর করতে নীতি তৈরি করা দরকার। এই সব সমস্যা বড় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বেশি হয় এবং তাদেরকে একটা অর্থ এই খাতের জন্য আলাদা করে রাখতে হয়। অবকাঠামোগত বাধার পাশাপাশি রয়েছে নানা ধরনের বাধা যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়। যেমন— তথ্য জানার অভাব, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, অদক্ষতা, প্রযুক্তি এবং বাজারের সমস্যা, এছাড়াও আরো দু'ধরনের সমস্যা রয়েছে যা হলো সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মীদের অসহযোগিতা এবং জবাবদিহিতার অভাব। এই জাতীয় পরিস্থিতি ব্যবসার প্রচুর ক্ষতি করে।

এ অবস্থায় প্রয়োজন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্বার্থ বিরোধী নীতিগুলো তুলে দেয়া এবং কার্যকর নীতি তৈরি করা । বাংলাদেশে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান তৈরি এবং নানা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যেমন— ক্ষুদ্র ঋণ, প্রশিক্ষণ, ভৌত অবকাঠামো সুবিধা।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে আধুনিকায়ন প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশে উচ্চতর প্রযুক্তি যেমন দরকার তেমনই দরকার ঐতিহ্যকে রক্ষা করা। এই শিল্পের উন্নয়নে এমন সব নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে যা দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন পরিস্থিতিতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে। একই সঙ্গে এই মাধ্যমকে বড় শিল্পের ধাক্কা থেকেও রক্ষা করতে হবে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে বাংলদেশে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে—

• ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পরিষ্কার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা
• বিসিককে আরও শক্তিশালী করা
• উদ্যোক্তাদের জন্য নিয়মনীতি সহজ করা
• বন্ধক ছাড়াই ঋণের ব্যবস্থা করা
• বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য- সহযোগিতা যাতে আরো তাড়াতাড়ি হয় তা নিশ্চিত করা
• বিসিকের শিল্প অঞ্চল বাড়ানো

• রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের নেটওয়ার্ক আরো বাড়ানো
• বিনিয়োগ বোর্ডের একটিমাত্র কেন্দ্র থেকেই যেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নের সকল কাজ করা সম্ভব হয় তা নিশ্চিত করা
• সরকার এবং ব্যক্তিমালিকানায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বাড়াতে কার্যকর ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করা
• ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে অন্যান্য শিল্প থেকে আলাদা করে পরোক্ষ করের হাত থেকে মুক্ত করা
• ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য বাণিজ্য নীতির সংশোধন করা

কৌশলগত লক্ষ্য	মূল লক্ষ্য	পিআরএসপি এজেন্ডা (২০০৫-২০০৭ অর্থবছর)	ভবিষ্যতে যা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে	দায়িত্ব
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন	বড় মাপে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন	• এই শিল্পে যে সকল শ্রমিক কাজ করছে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকে এমন একটি সংজ্ঞা তৈরি করে নিতে হবে যা সবাই মানবে • ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের যথাসাধ্য উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া • ঋণদানকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে • ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া • নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা • নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা • পেশাদারী সুবিধা নিশ্চিত করা	নারী উদ্যোক্তাদের বাধাসমূহ দূর করা	বিসিক, বিনিয়োগ বোর্ড, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়

১.৩ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নকে অনেকখানিই নিশ্চিত করা যায়। কোনো উদ্যোগের মূল উপাদানগুলো কেন্দ্র সরবরাহ করতে পারে না। কাজেই স্থানীয় সরকারের শক্তিশালী হওয়া বেশি জরুরি কেননা তারাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের কাছাকাছি থাকে।

ক্ষদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ও নীতি :

কেন্দ্রীয় সরকারের যা করা উচিত—

• বেসরকারি খাতকে বিশ্বাস করতে হবে, সরকারি সংস্থাগুলো বিশেষ করে স্থানীয় সরকার যাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করা
• স্থানীয় পর্যায়কে সত্যিকারভাবে শক্তিশালী করা
• স্থানীয় এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা দেওয়া
• বাজার তৈরিতে সহায়তা করা
• শুধু আউটপুটের উপর জোর না দিয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার উপর জোর দেওয়া
• উদ্যোক্তাদের সমাজে রোল মডেলের মর্যাদা দেওয়া
• ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত মতবিনিময় করা

কেন্দ্রীয় সরকারের যা করা উচিত নয়—

• কঠিন শর্ত ও কর্মসূচি চাপিয়ে দেওয়া
• কেন্দ্রীয় ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা
• ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সহায়তা ব্যবস্থাপনায় ‘কর্পোরেট মডেল’ চালু করা
• ব্যবসা বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য যথাযথভাবে সরবরাহ না করা

১.৪ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সামগ্রিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উদ্দেশ্যকে মেলানো

সামগ্রিক উন্নয়ন উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে চাকুরি সৃষ্টি, উৎপাদন, প্রতিযোগিতা , জিডিপি বাড়ানে, জিনিষপত্রের দামের স্থিতিশীলতা প্রভৃতি। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে বলা যায় দারিদ্র্য বিমোচনে এসএমই'র অবদান, কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কল্যাণ (যেমন— মহিলা কিংবা উপজাতীয়দের ব্যবসার উন্নয়ন) , কিংবা কোনো নির্দিষ্ট সেক্টরের উন্নয়ন (যেমন— পর্যটন কিংবা কৃষিনির্ভর উন্নয়ন) । আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে মিল রেখে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন উদ্যোগে ভূমিকা রাখতে পারে। এভাবে সামগ্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে মিল না রাখাতে এসএমই উন্নয়ন নীতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অকার্যকর হয়ে যাবে। কারণ একটা প্রয়োজনের পথ ধরে অন্য আবেকটি প্রয়োজন চলে আসে। এছাড়াও নীতি তৈরিকারীদের নতুন উন্নয়ন ভাবনাগুলোকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য সদাসর্বদা প্রয়োজনগুলো রিভিউ করতে হবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পনীতির সঙ্গে জাতীয় উদ্দেশ্যের যোগাযোগের জন্য এই সেক্টরের যেসব ভূমিকা বিবেচনার দাবি রাখে সেগুলো হলো —

• চাকুরি সৃষ্টির সংখ্যা এবং ধরন
• উৎপাদন ক্ষমতা এবং উন্নয়ন লক্ষ্য
• আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও রপ্তানিতে ভূমিকা
• আঞ্চলিক এবং স্থানীয় উন্নয়ন
• জাতীয় পরিকল্পনায় যেসব মূল শিল্প ও সেবাখাতকে টার্গেট করা হয়েছে
• বৈষম্য এবং দারিদ্র্য কমানো

১.৫ অ্যাডভোকেসিবিষয়ক প্রাথমিক ধারণা

১.৫.০ অ্যাডভোকেসি কী ?

অ্যাডভোকেসি এমন একটি প্রক্রিয়া যা নীতিনির্ধারনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য সারা বিশ্বের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মীরা, এমনকি নীতিনির্ধারকরা নিজেরাও ব্যবহার করেন। অ্যাডভোকেসি শুধু নীতি তৈরি বা নীতির সংস্কারের সঙ্গেই সম্পর্কিত নয়, একই সঙ্গে তা নীতির যর্থাথ বাস্তবায়নের সঙ্গেও যুক্ত।

অ্যাডভোকেসি নিয়ে কাজ করছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংগঠন। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সংজ্ঞা রয়েছে। সংজ্ঞাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

ক.অ্যাডভোকেসি হলো সংগঠিত উদ্যোগ ও কার্যক্রমের এমন হাতিয়ার যা গণতন্ত্রের উপাদানগুলোর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। রাষ্ট্র যন্ত্র, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারীদেরকে প্রভাবিত এবং প্ররোচিত করে নীতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে এই কার্যক্রমকে সুসংগঠিত করা হয়। নীতি তৈরিকারীরা এমন প্রক্রিয়ায় নীতি গ্রহণ, সংরক্ষন ও বাস্তবায়ন করেন যাতে করে যারা কম রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী কিংবা যাদের আর্থিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে তারা উপকৃত হয় এবং জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে সমর্থ হয়।

অ্যাডভোকেসি ইনস্টিটিউট, ওয়াশিংটন

খ. নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াই হলো অ্যাডভোকেসি।

কেয়ার

গ. বিভিন্ন জননীতি ও কার্যরীতি তৈরি, পরিবর্তন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এনজিওদের কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে জননীতি তৈরি ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িতদের প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াই হলো অ্যাডভোকেসি।

অক্সফাম, ইউকে

ঘ. যোগাযোগ পদ্ধতির কৌশলপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে জননীতি প্রভাবিত করার উদ্যোগই হলো অ্যাডভোকেসি। এখানে জননীতি বলতে প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরন নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কতৃক তৈরি নীতি, প্রথা বা বাণীকে বোঝায়।

জন হপকিনস্ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম

ঙ. তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক ও গণমাধ্যমকে ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগিয়ে তথ্য ও প্রযুক্তিকে রাজনৈতিক ও নেতৃত্বের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা এবং তার উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সমাজকে প্রস্তুত করে তোলাই হলো অ্যাডভোকেসি।

ইউনিসেফ

উপরের সংজ্ঞাগুলো থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়—

প্রথমত, অ্যাডভোকেসি হচ্ছে নীতি তৈরিতে জড়িতদের উদ্বুদ্ধকরণ। যেমন— সরকারি কর্মকর্তা/আমলা, সংসদ সদস্য, মন্ত্রী।

দ্বিতীয়ত, অ্যাডভোকেসি একটি সুচিন্তিত প্রক্রিয়া। কাজেই, অ্যাডভোকেসী কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে এটা নিশ্চিতভাবেই পরিষ্কার করে নেয়া দরকার আমরা কাকে বা কাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছি এবং আমরা কোন নীতির পরিবর্তন করছি। যেমন— ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা; ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে সম্পত্তি বন্ধক রাখার নীতি।

তৃতীয়ত, নীতিনির্ধারকরা বিভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে। নীতিনির্ধারক বলতে শুধু সরকারি পর্যায়ভুক্তদেরই বোঝায় না, বেসরকারি পর্যায় এবং সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও এই পর্যায়ভূক্ত। যেমন— বিষয় বিশেষজ্ঞ, সমাজে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত ব্যক্তিবর্গ।

১.৫.১ অ্যাডভোকেসি কী নয় ?

নিচের বিষয়গুলো অ্যাডভোকেসী নয়—

ক. সম্প্রসারণ কার্যক্রম— আমরা অনেক সময় পরিবারে ও কমিউনিটিতে কৃষি সম্প্রসারণ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা ও অভ্যাস পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে থাকি। এটা সধারনত সিদ্ধান্ড় বা নীতিপ্রণেতাদের প্রভাবিত করার জন্য করা হয় না। তাই এটা অ্যাডভোকেসি নয়।

খ. তথ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ— কমিউনিটির লোকজনের মধ্যে বিশেষ অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য কাজ করা অ্যাডভোকেসি নয়। তবে এক্ষেত্রে যদি জনমত গঠনের মাধ্যমে নীতি পরিবর্তনের জন্য ক্যাম্পেইন করা হয় তবে সেটা অ্যাডভোকেসী কম্পেইন।

গ. সরকারী অফিস আদালতে নিজ সংগঠন সর্ম্পকে জানানো— নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা অ্যাডভোকেসী অংশ হলেও শুধু নিজ সংগঠনকে পরিচিত করানো অ্যাডভোকেসী নয়।

ঘ. নিজ সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি— কোন একটি প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে কেবল নিজ সংগঠনের প্রোফাইল বা কার্যক্রম জনসমক্ষে তুলে ধরা অ্যাডভোকেসির অর্ন্তভুক্ত নয়।

ঙ. তহবিল গড়ে তোলা— অ্যাডভোকেসির প্রাথমিক লক্ষ্য তহবিল গড়ে তোলা নয়। তবে কোনো কোনো অ্যাডভোকেসি কাজের ফলে সংগঠনের তহবিল গড়ে উঠতে পারে এবং জনস্বার্থে তহবিল গড়ে তোলা হলে তা সংগঠনকেও লাভবান করে থাকে।

চ. ক্যাপাসিটি বিল্ডিং— সাধারণত সিদ্ধান্ড় বা নীতি- প্রণেতাদের প্রভাবিত করার জন্য করা হয় না। নিছক নিজস্ব সংগঠনের কর্মীর কাজের ক্ষমতা বাড়ানোও অ্যাডভোকেসি নয়।

১.৫.২ অ্যাডভোকেসির লক্ষ্য

সংজ্ঞাগত বিভিন্নতা থাকলেও অ্যাডভোকেসির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম সম্পর্কে কোন ধারণাগত পার্থক্য নেই। অ্যাডভোকেসীর মূল বিষয় হলো বর্তমান অবস্থাকে ‘আদর্শ’ অবস্থানে পরিবর্তন করা। যেমন— ব্যাংকগুলোর ঋণদান প্রক্রিয়াকে আরো সহজ ও উদ্যোক্তাদের অনুকূল করা।

অ্যাডভোকেসীর লক্ষ্য হলো—

• নীতি,আইন বা বিধি প্রণয়ন, সংস্কার বা বাস্তবায়ন করা
• সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্র তৈরি করা।
• বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রকৃত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা

১.৫.৩ অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্র

অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। বিশেষ কোনো জাতীয় পর্যায়েই অ্যাডভোকেসি সীমাবদ্ধ থাকবে এমনটি নয়, বরং তৃণমূলের অনেক বড় ও সুপ্ত ইস্যু আছে যা বেশি গুরুত্ব দাবি করতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অ্যাডভোকেসি সম্ভব। যেমন: পরিবেশ বান্ধব বলে পাটজাত দ্রব্যের ব্যাগ কিংবা পটারি বা মৃৎশিল্পের বাজারজাত করার আন্তর্জাতিক অ্যাডভোকেসি।

১.৫.৪ অ্যাডভোকেসির ধরন

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ অ্যাডভোকেসিকে তিন ভাগে ভাগ করেন:

ক. সেলফ অ্যাডভোকেসি— ব্যক্তি নিজের স্বার্থ আদায়ের জন্য যে অ্যাডভোকেসি করে। যেমন— ঋণ পাওয়ার পদ্ধতি সহজ করা।

খ. লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি— ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আইনি পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে অ্যাডভোকেসি করা। যেমন— বিএসটিআই- এর কাছ থেকে ছাড়পত্র নেওয়া।

গ. সিস্টেম অ্যাডভোকেসি/লেজিসলেটিভ অ্যাডভোকেসি/পলিসি অ্যাডভোকেসি/সোসাল জাস্টিস অ্যাডভোকেসি— জনমুখি আইন/নীতিমালা তৈরি, বাস্তবায়ন বা সংস্কার করার প্রক্রিয়া যা পুরো প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করে। যেমন— ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পৃথক বাজারের ব্যবস্থা করা।

অ্যাডভোকেসিকে অনেক বিশেষজ্ঞ আরো চার ভাগে ভাগ করেছেন:

ক. ইডিওলজিক্যাল অ্যাডভোকেসি—নীতিগত দিক থেকে প্রধান্য লাভ করার কৌশলকে বোঝায়।

খ. মাস অ্যাডভোকেসি—যেখানে জনসাধারণ যুক্ত থাকে এবং তাদের পক্ষে অ্যাডভোকেসি করা হয়। এক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহন এবং উদ্বুদ্ধকরণ জরুরি।

গ. ইন্টারেস্ট গ্রুপ অ্যাডভোকেসি—এ প্রক্রিয়ায় স্বার্থগোষ্ঠী তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে এই অ্যাডভোকেসি করে। এক্ষেত্রে ইস্যু সমূহ সুনির্দিষ্ট থাকে। সাধারনত নীতিগত প্রাধান্যের তুলনায় এ কার্যক্রমে বস্তুগত লাভালাভ অর্জনই প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। যেমন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য সকল ধরণের কর মওকুফ করা।

ঘ. ব্যুরোক্রেটিক অ্যাডভোকেসি—সাধারনত গবেষক, অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সক্রিয় থেকে আমলাতন্ত্র এবং এদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেন। আমলারাও তাদের সুপারিশ মেনে নেন। কেননা, উলি্লখিতরা 'বিশেষজ্ঞ' হিশাবে খ্যাত। যেমন— দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে এসএমই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা, উদ্যোগ নেওয়া।

১.৫.৫ অ্যাডভোকেসির বৈশিষ্ট্য

• পরিকল্পিত এবং অব্যাহত কর্ম
• সবসময়ই ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত
• ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করে
• অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনায় সমাজের অংশগ্রহণ ও মালিকানা থাকে
• রাজনৈতিক এবং নীতিনির্ধারন প্রক্রিয়ায় দাবি তোলে
• বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্কে নতুন বিন্যাস দাবি করে
• নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বার্থ তুলে ধরে
• তৈরি নীতিতে যাদের স্বার্থ জড়িত তাদেরকেই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে
• গতানুগতিক ইস্যুর চেয়ে দ্বন্দ রয়েছে এমন ইস্যু নিয়ে কাজ করে
• এমন ইস্যু যা স্পষ্ট এবং/অথবা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র তৈরি করে— যা অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়
• যারা এ কাজের ফলে সুফল ভোগ করবে অথবা যারা বুঝতে পারছে তাদেরকেও কাজে যুক্ত করে
• প্রাথমিক উদ্যোগ নেয়, নতুন কিছু চালু করে
• প্রক্রিয়াটি সবসময়ই চেষ্টা করে ও সৃষ্টি করতে চায়
• মানুষকে বোঝাতে সাহায্য করে যে, তাদের সুনির্দিষ্ট অধিকার আছে এবং তা আদায় করা সম্ভব
• সাধারণত একটি ইস্যুতেই করা হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন ইস্যুতে করা হলে প্রতিটি ইস্যুকেই সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়; লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হলে ভিন্ন ভিন্ন ইস্যুও একটি এককের মতই কাজ করে
• সাধারণত সেই ধরনের অধিকার বা সুবিধা আদায়ের জন্য করা হয় যা ঐ ব্যক্তি বা ঐ গোষ্ঠি পাওয়ার জন্য স্বীকৃত
• কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানিকীকরন নিশ্চিত করতে সাহায্য করে

• মোর্চা ও মৈত্রী গঠনের মাধ্যমে আরো বড় প্লাটফরম ও শক্তি গড়ে তোলে। এর ফলে বিভিন্ন গ্রুপ, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়
• যাদের হাতে খুব সামান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষমতা বা সংযোগ রয়েছে তাদের কথা বলার অধিকার, সংযোগ ও ক্ষমতা বাড়ায়
• ভারসাম্য নেই এমন ক্ষমতা কাঠামোয় ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে
• একদম নিচের বা তৃণমূল পর্যায়ের কাজকর্ম ও তৎপরতার সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ের নীতিগত ইস্যুর যোগাযোগ ঘটায়
• জাতীয় পর্যায়ে সফলতার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে একতাবদ্ধ করাও অ্যাডভোকেসি তৎপরতা হিশাবে পরিচালিত হয়
• তৃণমূল কমিউনিটি, স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অ্যাডভোকেসি উদ্যোগের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় ঘটায়
• নেতৃত্বের অংশগ্রহণমূলক বিকাশ হয়, জনসমাজকে একতাবদ্ধ করে
• দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা, ভালোবাসার মনোভাব গড়ে তোলে

১.৫.৬ ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাডভোকেসি

অ্যাডভোকেসি কাজকর্মের মাধ্যমে কেবল জনসাধারণ উপকৃত হয় তা নয়, বরং যে ব্যক্তি বা সংগঠন কাজ করে তারও উপকার হয় । যেমন—

• আত্মবিশ্বাস বাড়ে। যে কোনো উদ্যোগ নিজেরাই নেওয়ার মত সাহস তৈরি হয়
• জনগণকে নিয়ে কাজ করার ফলে পাবলিক প্রসেস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তৈরি সম্ভব হয়
• এই বোধ জন্মে যে—সবাই গুরুত্বপূর্ণ, সবাইকে নিয়েই সমাজ, ফলে দায়িত্বও সবার
• অনেক বেশি মানুষের সামনে নিজেকে তুলে ধরার সামর্থ্য বাড়ে, নিজের দাবি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই তুলে ধরাও এতে সম্ভব হয়
• আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে পরিচয় হয়
• সম্মিলিত বোধ জন্মে, ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্যোগ নেওয়ার এবং দাবি আদায়ে শক্তি বাড়ে

এই অধ্যায়ে যা আছে

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অ্যাডভোকেসির প্রয়োজনীয়তা, সুফল এবং মহিলা উদ্যোক্তা সম্পর্কে

শিল্প নীতি ২০০৫-এ কী বলা হয়েছে

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং অ্যাডভোকেসি

২.০ ভূমিকা

জীবনধারণ এবং জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে মানুষ তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন পেশায় সম্পৃক্ত হয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে বিষয়টি আসে তা হলো এদেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং ক্ষুদ্র আয়তন । আয়তনে ক্ষুদ্র হবার কারণে এদেশে চাষযোগ্য জমি যেমন কম ঠিক তেমনি জনসংখ্যা অনুপাতে চাকুরির সংখ্যাও কম। ফলে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে আয়ের নানামুখী উৎস অনুসন্ধান করা অত্যন্ড় প্রয়োজনীয়। অধিক জনসংখ্যার ব্যপারে পক্ষে বিপক্ষে দুদিকেই মতামত রয়েছে । এই জনসংখ্যাকে যদি কার্যকর জনশক্তিতে রূপান্ড়রিত করা যায় তবে তা হবে এদেশের জন্য সম্পদ। কিন্ড় তা না করা গেলে এই জনসংখ্যা দেশের জন্য হয়ে দাড়াবে বিপদ।

আমাদের দেশে প্রচুর সংখ্যক বেকার রয়েছে। এদের বেশীরভাগই শিক্ষিত বেকার। এই শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যায় রয়েছে উচচ শিক্ষিতরা। বাকি সবাই মাঝারি শিক্ষিত, অর্থাৎ মাধ্যমিক বা উচচ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ সমাপ্ত করেছে। অনেকেরই আবার শিক্ষা গ্রহণের সুযোগই ঘটে না। এদের অধিকাংশ নিয়োজিত হয় কৃষিকাজ বা অন্যান্য শ্রমসংশি৷ষ্ট কাজে। অন্যরা কর্মহীন থেকে যায়।

কর্মহীন বা বেকার থাকলেও জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা তো থেমে থাকে না। আর সেজন্য দরকার আয় রোজগার করা। আবার এদেশে অনেক পরিবার আছে যাতে পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি/ব্যক্তিদের আয়ে সেই পরিবারের সকল প্রয়োজনীয়তা মেটানো সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রেও সেই পরিবারের অন্য সদস্যদেরও আয়ের পথ অনুসন্ধান করতে হয়।

উপরোক্ত এসব প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা থেকেই মূলত: ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের সূত্রপাত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগন নিজ উদ্যোগে ক্ষুদ্র পরিসরে এসব শিল্প স্থাপন করে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় পুজি তারা সংগ্রহ করে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে।

স্থানীয় পর্যায়ে এসব উদ্যোগের সফলতা যেমন রয়েছে , তেমনি ব্যর্থতার কাহিনীও রয়েছে। এজন্য এসব উদ্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে বিরাজমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তার যথাযথ প্রতিকার অনুসন্ধনের মাধ্যমে একে একটি সাফল্যপূর্ণ এবং দেশের উন্নয়নে সহায়ক একটি ক্ষেত্রে পরিণত করা সম্ভব।

২.১ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অ্যাডভোকেসি কেন প্রয়োজন?

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি— দু' পর্যায় থেকেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের শিল্প স্থাপন অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে । এদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বাস দারিদ্র্যসীমার নীচে। চরম দারিদ্র্যের অভিশাক্লিষ্ট এসব মানুষ তদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের জন্য নিরন্তর সংগ্রামে রত। খাদ্য ও বস্ত্রের মত অতি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সংগ্রহেই যেখানে তাদের গলদঘর্ম অবস্থা হয়, সেখানে শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারটা তাদের কাছে বিলাসিতার মত হয়ে দাড়ায়। বিনাবেতনের প্রাথমিক শিক্ষা, কংবা খুব বেশী হলে মাধ্যমিক বা উচচ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিস্তৃতি পায় তাদের শিক্ষাগ্রহণের সীমারেখা। এর ফলাফল দাড়ায় এই যে, একটি বিশাল স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠি তাদের অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগানোর সুযোগ পায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কারণ, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের চাকুরীলাভের সুযোগ খুবই সীমিত। আবার তারা যদি কৃষিকাজ বা এজাতীয় অন্য কোন কাজে নিযুক্ত হয় যেখানে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োগ করার কোন সুযোগ নেই, তাহলেও তাদের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান অব্যবহৃতই থেকে যায়। এতদপ্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে আত্মকর্মসংস্থানের উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। সরকারের এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহযোগীতা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় পর্যায়ের এসব উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগীতা করার ব্যবস্থা রেখেছে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন এনজিও এ কাজ করে যাচ্ছে।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে সরকারি এবং বেসরকারি এসব ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে ; কিংবা ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং সুষ্ঠু পরিচালনায় এসব ব্যবস্থা কতটুকু ফলপ্রসূ হচ্ছে। এসব প্রশ্নের উত্তরে যে চিত্রটি পাওয়া যায় তা হলো, সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ের এতসব সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও এই সম্ভাবনাময় খাতটি আশানুরূপ সফল্যলাভে সক্ষম হচ্ছে না।

এই বাস্তবতা থেকেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পবিষয়ক অ্যডভোকেসির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়।

২.২ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অ্যডভোকেসির সুফল

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে অ্যডভোকেসি র সুফল আলোচনা করতে গেলে এ শিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা এবং অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে সম্ভাব্য ধণাত্মক পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ৩ টি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা জরুরী ।

এই তিনটি পর্যায় হচ্ছে—

ক.মূলধন সংগ্রহ

খ. শিল্প স্থাপন এবং

গ. বাজারজাত করা

এই তিনটি পর্যায়েই উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতার সন্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যাগুলো শিল্প ভেদে বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। এসব সমস্যা নিরসন করতে পারলে, নিদেনপক্ষে একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারলে এই খাতে আশনুরূপ সাফল্য লাভ করা সম্ভব। ব্যক্তি পর্যায় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে এই ব্যাপক বিস্তৃত ক্ষেত্রের সমস্যাসমূহ সমাধান করা সম্ভব নয়। কাজেই প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ গহণ এবং ব্যাপক আকারে একক কর্মসূচী প্রণয়ন। অ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের তিনটি পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন খুবই সম্ভব। কাজেই প্রয়োজনীয় ইস্যুতে অ্যাডভোকেসী প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোক্তারা নিজেরা আত্মনির্ভরশীল এবং লাভবান হবার পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নেও যথেষ্ট ভূমিকা কাখতে পারবে।

২.৩ মহিলা উদ্যোক্তা সম্পর্কে শিল্প নীতি ২০০৫-এ কী বলা হয়েছে?

ধারা ১১.৪— ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মহিলা শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠায় আরো বেশী উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিবিধ ইনসেনটিভ ও আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ধারা ১১.৫— মহিলা উদ্যোক্তাদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদার প্রেক্ষাপটে এসএমই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কারিগরী আর্থিক ও প্রয়েজনীয় প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে শিল্পমন্ত্রণালয়ের আওতায় স্থাপিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (যেমনবিসিক, বিটাক, বিআইএম, এনপিও, স্কিটি) এর সহায়তায় মহিলা শিল্পোদ্যোক্তাদের বর্ধিত কলেবরে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আধুনিক কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ধারা ১১.৬— সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিজের সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে মহিলা শিল্পোদ্যোক্তাদের অধিকহারে প্রাধান্য দেয়া হবে।

ধারা ১১.৭— দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্টা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মহিলা শিল্পোদ্যোক্তাদের অধিকতর আগহী করে তোলা হবে। অনুরূপভাবে গার্মেন্টস শিল্প (নীট ও ওভেন), ইলেক্ট্রনিক্স, সিরামিক, হোসিয়ারী, হিমায়িত খাদ্য, হিমাগার, হাই-ভ্যালু-এ্যাডেড শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদের কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

ধারা ১১.৮— ডেকোরেশন সামগ্রী, চামড়াজাত পণ্য, এমব্রোয়েডারী, ইমিটেশন, বক-বাটিক, হস্তশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প, খেলনা, উপহার সামগ্রী ইত্যাদিতে মহিলা শিল্পোদ্যোক্তাদের অধিকহারে উৎসাহ ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে।

ধারা ১১.৯— দেশে মানসম্পন্ন মহিলা শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাগ্রহণ এবং একই সাথে যথোপযুক্ত পুঁজি সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করে এসএমই এবং কুটির শিল্পা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চত করা হবে। এলক্ষ্যে দেশের সকল বিভাগীয় শহরে শিল্প পার্কসমূহে মহিলা শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য কিছু পট সংরক্ষিত রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

ধারা ১১.১২— মহিলা শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প ঋণ, ইকুইটি ক্যাপিটাল, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, চলতি মূলধন ইত্যাদি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে সরকারী কিংবা বেসরকারী উদ্যোগে দেশে একটি পৃথক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা এবং মহিলা শিল্প উদ্যোক্তাদের উপযুক্ততা যাচাই করে সহজ শর্তে বন্ধকী- মুক্ত (Co-lateral free) ঋণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

<u>কেস স্টাডি: মোঃ শাজাহান, মধুচাষী, ফরিদপুর</u>

বিসিক কর্তৃক দুঃস্থ মহিলাদের মধু চাষে প্রশিক্ষন কার্যক্রম দেখে উৎসাহিত হয়ে চারশ টাকা দিয়ে একটি বাক্স কিনে মোঃ শাজাহান ১৯৯৩ সালে মধু চাষ শুরু করেন। তখন তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র। শুরুতে তিনি দেশি জাতের মৌমাছি পালন করলেও এখন উন্নত জাতের মধু চাষ করছেন। বর্তমানে তিনি বাইশটি বাক্সে মৌমাছি পালন করছেন। এর মধ্যে তেরটি ফদিপুরে এবং নয়টি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায়। ফরিদপুরে উন্নত জাতের মৌমাছির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পাওয়া যায় না বলে তাকে উল্লাপাড়ায় বাক্স স্থাপন করতে হয়েছে। উন্নত জাতের মৌমাছির স্বল্পতা, খাদ্যের অভাব এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে মধু উৎপাদনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে মোঃ শাজাহান মনে করেন সরকার চিনি উৎপাদনের জন্য যেমন অর্থ সাহায্য দিয়ে আখ উৎপাদনে উৎসাহিত করে তেমনই সরিষা, ধনে, লিচু প্রভৃতি উৎপাদনেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। অধিকাংশক্ষেত্রেই খোলা বাজারে মধু বিক্রি করতে হয়। এক্ষেত্রে মোঃ শাজাহানের অভিমত হলো সব চাষী একত্রে মধু বাজারজাত করলে এবং বিএসটিআই এর অনুমোদন পাওয়া গেলে মধু প্রক্রিয়াজাত এবং বাজারজাত করার অনেক সুবিধা হবে। কোনো ঋণ না নিয়ে একজন মধু চাষী হিশাবে সফলতা লাভ করা মোঃ শাজাহান অদূর ভবিষ্যতে সকল বাধা দূর হলে আরও ভালো করার স্বপ্ন দেখেন।

ব্যবসায় প্রবৃদ্ধির জন্য বিপননের প্রসার জরুরি। তাই মোঃ শাজাহান অনেক সময় তার ছোট ভাই ও তার সহপাঠীদের সাহায্য নিয়ে থাকেন। এরা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। তাদের সহযোগিতায় মোঃ শাজাহান মাসে দু'এক বার তিন-চারশ' লিফলেট ছাপিয়ে বিভিন্ন স্কুলে ছুটির সময় ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে বিলি করেন। ঐসব লিফলেটে মধুর পুষ্টি গুণ বর্ণিত থাকে। এর ফলে তাঁর ক্রেতা কিছুটা বেড়েছে। এই কাজটা তিনি আরো ভালভাবে করতে পারতেন যদি তিনি অ্যাডভোকেসির কোয়ালিশন টুলটা ব্যবহার করে বিপননের উদ্যোগ নিতেন। তিনি তার জেলার আরো কয়েকজন মধু চাষীর সাথে যোগাযোগ করে যদি সম্মিলিতভাবে প্রচারণা চালাতেন তবে প্রচারণাও জোরদার হতো, আবার সকল উদ্যোক্তা পরামর্শ করে বিপননের নতুন নতুন কৌশলও প্রয়োগ করতে পারতেন। তাঁদের সবার পণ্য এক নামে একটি বিক্রয় কেন্দ্র খুলে সেখান থেকে বিক্রয় করতে পারতেন। সম্মিলিত প্রয়াস নিলে বিপননের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তহবিল গঠন করাও সম্ভব হত।

এই অধ্যায়ে যা আছে

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রয়োজনীয়তা, বিশ্বায়ন পরবর্তী পর্যায়ে এর বাস্তবতা, অ্যাডভোকেসির ইস্যু নির্বাচন, ইস্যু বিশ্লেষণ, অডিয়েন্স চিহ্নিত করা, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা নির্ধারণ, এসএমই'র উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সামগ্রিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উদ্দেশ্যের সংযোগ স্থাপন, এসএমই'র বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ, নির্দিষ্ট কোনো সহায়তা কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্পর্কে ভাবনা এবং সমস্যা নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা।

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অ্যাডভোকেসির ধাপ

৩.০ ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে গেলে বাংলাদেশের জনসংখ্যার আধিক্য, বিস্তারলাভের সুযোগের সীমাবদ্ধতা এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়গুলো আলোচনায় চলে আসে।

দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশই কেবল সক্ষম হয় শিক্ষালাভ করতে। এই অংশের অনেকেই আবার আশানুরূপ চাকুরীলাভের ব্যর্থ হয়ে বেকার হয়ে যায়। উচ্চ শিক্ষিত অংশের বাইরে মাঝারী শিক্ষিত এবং শিক্ষালাভে বঞ্চিত জনগোষ্ঠির একটি বৃহৎ অংশ কৃষি এবং কৃষিসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট অংশ আত্মকর্মসংস্থানের পথ বেছে নেয়। এই আত্মকর্মসংস্থানের পথেই গড়ে ওঠে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারী পর্যায়ের শিল্প। বিশেষত: স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত এসব শিল্পের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বায়ন পরবর্তী প্রতিযোগীতার যুগে এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য জাতীয় অর্থনীতিতে রাখতে পারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আর এজন্য প্রয়োজন এসব প্রতিষ্ঠানকে সফল এবং টেকসই করে গড়ে তোলা।

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ন্যুনতম জীবন সংগ্রহের প্রয়োজনে শুরু হওয়া এসব শিল্প পরবর্তীতে সাফল্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে ক্রামোন্নয়নের পথে যেমন অগ্রসর হয়েছে, তেমনিভাবে কোনরকমে টিকে থাকা থেকে শুরু করে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। এই ক্ষেত্রটিকে বাস্তব অর্থে কার্যকর এবং জাতীয় অর্থনীতিতে যথার্থ অবদানপূর্ণ করতে প্রয়োজন একে সম্ভাব্য সর্বাধিক সফলতা লাভের পথে পরিচালিত করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা। এই দিকনির্দেশনা লাভ করতে হলে আমাদের এই ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো নির্ধারন করে ইস্যুভিত্তিক অ্যাডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৩.১ ইস্যু নির্বাচন করা

একটি সমস্যার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার মূলে যে কারনটি রয়েছে সেটা করাই হচ্ছে ইস্যু নির্বাচন। অর্থাৎ কোন একটি সমস্যা সমাধানের জন্য মূল যে কাজটি দূর করার জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম প্রয়োগ করতে হবে তাই ইস্যু।

অ্যাডভোকেসিতে সমস্যা হচ্ছে একটি নিদিষ্ট জনগোষ্ঠিকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে এমন পরিস্থিতি, যেমন— দূর্নীতি, সন্ত্রাস, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি প্রভৃতি। এক একটি সমস্যার ভেতর বেশ কয়েকটি ইস্যু থাকতে পারে যেমন— সন্ত্রাস আমাদের দেশের একটি প্রধান সমস্যা। এটা সমাধান করতে যেসব ইস্যু নিয়ে কাজ করা যায় সেগুলো হলো— নৈতিক শিক্ষা দান, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যথাযথ দায়িত্ব পালন নিশ্চিতকরন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি।

ইস্যু নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমেই যেসব বিষয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন সেগুলো হলো— ইস্যুটির সমাধানযোগ্যতা ও ব্যয়সাপেক্ষতা, ইস্যু নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও তার মোকাবেলার কৌশল, এবং এই কার্যক্রমে বিভিন্নমুখি সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাব্যতা।

এছাড়াও ইস্যু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরও যেসব বিষয় বিবেচনার দাবি রাখে সেগুলো হলো—

• এই ইস্যুর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্ম
• ইস্যু বিষয়ে রাষ্ট্র, সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের বর্তমান নীতি
• বর্তমান নীতি কার্যকর না হওয়ার কারণ
• আগে এই ইস্যু নিয়ে কাজ হয়েছে কি না
• এই ইস্যুর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন জনগন এবং ভুক্তভোগীরা এ ব্যাপারে কতটা সচেতন
• এ ব্যাপারে নাগরিকসমাজ ও অন্যান্য পেশাজীবির মত
• ইস্যু বাস্তবায়নে কোনো নীতিমালাগত জটিলতা রয়েছে কি না

উপরের বিষয়গুলো বিবেচনা করার পর ইস্যু নির্বাচনের যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা যাচাই করতে নিচের বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করতে হবে—

• বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ কি না
• বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু
• বিষয়টি সবার কাছে আকর্ষণীয় বা উদ্দীপক কি না
• বিষয়টির সংবাদমূল্য রয়েছে কি না

যে কোনো ইস্যুকে সবার কাছে বিশেষ করে উপকারভোগী, নীতি-প্রণেতা ও প্রয়োগকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে হলে নিচের দিকগুলো নিশ্চিত করতে হবে—

• ইস্যুর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে হবে
• কারা সমস্যায় আছে সে সম্পর্কে তথ্য থাকতে হবে
• এ বিষয়ে কোনো নীতি থাকলে তা বাস্তবায়ন না হওয়ার কারন তুলে ধরতে হবে
• নাগরিকসমাজ, বিভিন্ন পেশাজীবির মত থাকতে হবে
• বাস্তবায়নের পরিষ্কার দিক-নির্দেশনা থাকতে হবে
• বাস্তবায়িত হলে এর ফল কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিষয়ক ইস্যু নির্বাচনে যেসব বিষয় বিবচনা করতে হবে সেগুলো হচ্ছে—

• এবিষয়ক সমস্যার কারণে কাদের ক্ষতি হচ্ছে?
• এ ব্যাপারে আদৌ কোনো পলিসি আছে কি না, থাকলে সেটা কী?
• পলিসি থাকলে বাস্তবায়ন না হবার কারণ
• এ বিষয়ক কোনো কাজকর্ম আগে হয়েছে কি না
• যারা সমস্যায় আছে তাদের মত
• সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের মত
• ইস্যু বাস্তবায়নের আনুমানিক মেয়াদ
• বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষ জনশক্তি এবং আর্থিক অবস্থা

৩.২ ইস্যু বিশ্লেষণ করা

মাঠপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সাথে মতবিনিময় বা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কিংবা বাস্তব চিত্র পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে ইস্যু বাছাই / নির্বাচন করা হয়ে থাকে। এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ইস্যু বিশ্লেষন। ইস্যু-বিশ্লেষনের ফলে বস্তুনিষ্ঠ ও কার্যকর ইস্যু নির্ধারনের ক্ষেত্র উম্মোচিত হয়। এছাড়া এর ফলে সম্ভাব্য সমর্থক ও সহায়ক গোষ্ঠী সম্পর্কে ধারনা লাভ করা যায়।

ইস্যুভিত্তিক বিশ্লেষনের দু'টি পর্যায় রয়েছে— ইস্যু নির্বাচনপূর্ব এবং ইস্যু বাস্তবায়নোত্তর।

ইস্যু বাস্তবায়নপূর্বক বিশ্লেষনে ইস্যুর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, পলিসি বা আইন, বাজেট আওতাভূক্ত জনগোষ্ঠি প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা / পর্যালোচনা করা হয়। ইস্যু বাস্তবায়নের ফলে সমাজে কি ধরনের প্রভাব পড়েছে, পরবর্তী করনীয় কি হতে পারে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি ইস্যু বাাস্তবায়নোত্তর বিশ্লেষনের মূল উদ্দেশ্য।

৩.৩ অডিয়েন্স চিহ্নিত করা

অডিয়েন্স বলতে বোঝায় কাদের সাথে অ্যাডভোকেসী কার্যক্রম পরিকল্পনা করতে হবে। ইস্যু ও লক্ষ্য নির্ধারনের পর তার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়ন কাজে কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারে এমন ব্যক্তি, সংগঠন বা সংস্থাকে অ্যাডভোকেসি কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। স্থানীয় এবং জাতীয় দু' পর্যায়েই অডিয়েন্স চিহ্নিত করতে হবে।

যেমন— ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসংক্রান্ত অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রে অডিয়েন্স হতে পারে ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিল্প মন্ত্রনালয়, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, বিসিক প্রভৃতি। এছাড়াও সাংবাদিক, নাগরিক সমাজ, রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন এনজিও এরাও অডিয়েন্স হতে পারে।

৩.৪ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা

চারটি সূচক পর্যবেক্ষণ করতে হবে জাতীয় , সেক্টর ভিত্তিক এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে।

ক. নতুন ব্যবসার সূচনা— এটা বিভিন্নভাবে করা যেতে পারেঃ ব্যবসা রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স রিটার্ন, লাইসেন্সের জন্য আবেদন, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শুমারী বা নমুনা সংগ্রহ।

খ. টিকে থাকার হার— এটা নির্ধারণ করা কঠিন। একটা মিথ আছে যে প্রতি ৫ টি নতুন ব্যবসার মধ্যে তিনটিই পাঁচ বছরের মধ্যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই 'ব্যর্থতার হার' এর কারণে নতুন ব্যবসা শুরু করা বা এক্ষেত্রে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করাকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করা হয়। অনেক ব্যবসার ক্ষেত্রেই মালিকের হাতবদল হয় কিংবা মালিকানার রূপ পরিবর্তন হয়।

গ. সেক্টরের প্রবৃদ্ধি— এটা নিরূপন করতে হবে আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে প্রবৃদ্ধি ভিন্ন হতে পারে। কাজেই বিভিন্ন এলাকার জন্য বিভিন্ন পলিসির প্রয়োজন হবে। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভূমিকাও নির্নয় করা যায়ঃ মহিলা এবং আদিবাসীদের সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণকল্পে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

ঘ. দৃষ্টিভঙ্গি নিরূপন— সময়ের সাথে সাথে এসএমই'র অবস্থা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবসা শুরু এবং সমৃদ্ধকরণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি নিরূপন করা যায়।

৩.৫ সরকারি আইনের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা

সরকারের আইন ও নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কার প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা খুবই জরুরি। বর্তমান অবস্থায় বড় শিল্পগুলো অধিক প্রভাববিস্তার করে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো তথ্যলাভের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। এছাড়া, আইন ও নীতি মেনে চলতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পগুলোর তুলনামূলকভাবে বেশী ব্যয় করতে হয়।

আইনের প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্য যেসব ক্ষেত্রে নজর দিতে হবে সেগুলো হচ্ছে—

• স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর
• ব্যবসার লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন
• ব্যবসার সাথে ব্যবসার এবং ভোক্তার লেনদেনের উপর প্রভাব
• ব্যবসার পরিবেশ, ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত লোকজনের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা
• সরকারি সম্পদে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রবেশ ক্ষমতা

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোর অনেক সমস্যা এড়ানো যায় যদি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা যায় যে এটি—

• প্রয়োজনীয়— কীভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিষয়ক সমস্যা সমাধান করবে ?
• কার্যকর— উপকারিতা খরচের চেয়ে বেশি কি না ?
• সঙ্গতিপূর্ণ— এটি ব্যবহারের দিক থেকে আইনের অন্যান্য ধারার সঙ্গে মেলে কি না?
• ন্যায়সঙ্গত— এতে কি সবার সমান প্রবেশ ক্ষমতা থাকবে ?
• স্বচ্ছ— প্রয়োগ কি যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ/মনিটর করা যাবে ?
• সহজবোধ্য— সকল নাগরিক এবং উদ্যোক্তা বুঝতে পারবে কি না ?

৩.৬ নির্দিষ্ট কোনো সহায়তা কাজের মূল্যায়ন করা

এসএমই'র কল্যাণার্থে কোন নীতি বা কর্মসূচী গ্রহণ করার পর তার মূল্যায়ন করতে গেলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে—

• প্রতিক্রিয়া— সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গ্রহীতাদের প্রতিক্রিয়া জানা
• শিক্ষা নেওয়া— প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জানা যে, গ্রহীতারা সহায়তা কর্মসূচি কতটুকু বুঝতে পারছে
• আচরণ— নতুন নীতি চালুর ফলে গ্রহীতারা কেমন আচরণ করছে এটা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা যাবে

• মাঝপথে বা শেষের কাজ— অডিট বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা যে, নতুন চালু করা সহায়তার ফলে কী উন্নতি সাধিত হয়েছে

- চূড়ান্ত প্রভাব—টার্নওভার, লাভ, নিয়োগ- এসব তথ্য নিয়ে জানা যে, ব্যবসায় কাজকর্মে এর প্রভাব কেমন হচ্ছে

৩.৭ সমস্যা নির্দেশ করা

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে সমস্যা নির্ধারনকল্পে সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় এবং বিশ্লেষনের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি সমস্যা নির্ধারন করা হয়েছে। এই সমস্যগুলোকে সাধরনত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়- শিল্প স্থাপনের পূর্বে প্রয়োজনীয় পুজি সংগ্রহে, শিল্প স্থাপন এবং পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে।

<u>কেস স্টাডি : আর কে গার্মেন্টস</u>

ফরিদপুর শহর সংলগ্ন অম্বিকাপুর নিজ বাড়িতে আজ থেকে আড়াই বছর আগে রোজিনা খান শুরু করেছিলেন দুটি মেশিন দিয়ে টেইলারিং এর কাজ । এখন তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর কে গার্মেন্টস এ ১৩ টি সেলাই মেশিন ও ২ টি এমব্রয়ডারি মেশিনসহ মোট ১৫ টি মেশিনে কাজ হয়। ২ জন পুরুষ সহকর্মী ব্যতীত অন্য সবাই মহিলা। এ কাজের জন্য রোজিনা খান এতদঞ্চলের সকলকেই বিনা পারিশ্রমিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। রোজিনা খান প্রথমে যুব উন্নয়নের ট্রেনিং নিয়ে কাজ শুরু করেন। একই সঙ্গে পারিবারিক অন্যান্য দায়িত্ব এবং নিজের পড়াশুনা চালিয়ে যাচেছন। এখন তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় স্নাতকোত্তর পরিক্ষার্থী। প্রথম শুরু করেছিলেন পরিচিত জনদের অর্ডারের ভিত্তিতে তৈরী পোষাক সরবরাহের মধ্য দিয়ে । এখন তিনি এবং তার স্বামী উভয়েই বৃহত্তর ফরিদপুর, মাগুড়া ও ঝিনাইদহেও নিজেদের তৈরী পোষাকের বাজার বিস্তৃত করেছেন।
এইসব সম্ভাবনার মাঝে রয়েছে অনেক সমস্যা যা তাকে পেছনে টেনে ধরছে। ধরা যাক ভাল ডিজাইনের অভাব, যে কারণে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে পারছেনা। “উন্নয়ন সংস্থা ‘আশা’র কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল আশি হাজার টাকা, সূদ সহ ফেরত দিতে হয়েছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা।” সরকারী সংস্থা যেমন যুব উন্নয়ন অত্যন্ত সীমিত পরিসরে ঋণ দেয়। কিন্তু ব্যংক ঋণ দানের জন্য নানা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় যেমন ধরা যাক জমির দলিল, পৌর সভার ভিতরে না বহিরে ইত্যাদি নানাবিধ জটিলতা যা শুধুমাত্র সময়ই ক্ষেপন করে।

নিত্য নতুন ডিজাইন দিয়ে কোন উন্নয়ন সংস্থা সমূহ তেমন সহযোগীতা করে না। উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরও রয়েছে সমস্যার বেড়াজাল। যেমন বাজারজাতকরন, তৈরী পোষাক দোকানে সরবরাহ করেছি কিন্তু দোকানদার টাকা সময়মত পরিশোধ করে না এমনকি অনেক সময় টাকা আত্মসাৎ করে অথবা হুমকি দেয়। নানা লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিস্ট

মার্কেটের বনিক সমিতিও এগিয়ে আসে না। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতাও পাওয়া যায় না। উন্নয়ন কর্মীদের পক্ষ থেকেও কোনরকম সহযোগিতা মেলে না।

রোজিনা খান তার প্রতিষ্ঠান নিয়ে আশাবাদী, কিন্তু বাস্তবতা তার সে আশায় ভরসা যোগাচ্ছে না। রোজিনা খান জানেন না এ সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা কি, কিংবা তার সমস্যা সমাধানের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিই বা কি হতে পারে, এবং এই ক্ষেত্রে কে বা কারা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। এই বিষয়গুলো জানতে হলে রোজিনা খানকে সরকারী নীতিমালা জানতে হবে এবং তার সমস্যার মূল ইস্যুগুলো চিহ্নিত করে তার যথাযথ বিশ্লেষণ এবং কাদের সাহায্যে সমস্যার উত্তরণ ঘটানো সম্ভব তা নির্ধারণ করতে হবে। এসব কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করতে পারলে রোজিনা খান তার সমস্যা সমাধানের পথে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবেন।

এই অধ্যায়ে যা আছে

অ্যাডভোকেসির বাস্তব প্রয়োগের জন্য কৌশল নির্ধারণ, কৌশল তৈরির মডেল, কৌশল বাস্তবায়নে সহায়ক টুলস নির্বাচন, তহবিল সংগ্রহ বা বাজেট তৈরির প্রক্রিয়া এবং ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা তৈরি প্রণালি।

চতুর্থ অধ্যায়

বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি

৪.০ ভূমিকা

সমস্যা নির্ধারন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্য / নির্দেশনা লাভ করার পর অ্যাডভোকেসীর বাস্তব প্রয়োগ প্রক্রিয়া নির্ধারন করতে হবে। এতে অ্যাডভোকেসী প্রক্রিয়ার বাস্তব প্রয়োগ কৌশল এবং কর্মপদ্ধতি চূড়ান্ত করা হয়। এছাড়াও এ পর্যায়ে অ্যাডভোকেসী কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। এ পদ্ধতি অনসরণ করে অ্যাডভোকেসী কাজে জড়িত সকল অংশীদার যার যার দায়িত্ব পালনের দিক নির্দেশনা পেয়ে থাকে।

৪.১ কৌশল নির্ধারণ করা

অ্যাডভোকেসী কর্মসূচীর বাস্তবায়নের সফলতা নির্ভর করে সামগ্রিক কর্মকৌশল নির্ধারনের উপর। এখানে দু'টো কৌশল প্রনয়ন মডেল উপস্থাপন করা হল। মনে রাখতে হবে এ দু'টোর কোনটির ব্যবহার করা হবে সেটা নির্ভর করবে বাস্তবায়নকারী সংগঠনের বা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, অ্যাডভোকেসীর প্রকৃতি ও ইস্যুর ব্যপকতার উপর। এমন কি এই মডেলগুলোর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সাধন করে ব্যবহার করা সম্ভব।

৪.১.০ কৌশল নির্ধারণ করতে পাঁচ প্রশ্নের মডেল

এই মডেলটি অপেক্ষাকৃত কার্যকর। কেননা এতে এমন সব সহজ সরল প্রশ্নের সমাবেশ ঘটেছে সেগুলো আনেক অ্যাডভোকেটই সাধারনত অনুশীলন করে থাকেন।

এই কৌশল নির্ধারণ করতে হলে কয়েকটি প্রধান প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। পাঁচটি মূল প্রশ্ন হলো—

এক. উদ্দেশ্য— আমরা কী চাই ?

দুই. শ্রোতা— যে কাজ করতে চাওয়া হচ্ছে তা করতে কারা সক্ষম ?

তিন. যাচাই— আমাদের দ্বারা কী করা সম্ভব ?

চার. কাজের পরিকল্পনা— কীভাবে আমরা কাজ শুরু করব ?

পাঁচ. মূল্যায়ন— কীভাবে আমরা জানব যে আমাদের পরিকল্পনা ঠিকভাবে কাজ করবে ?

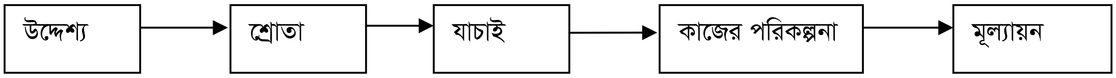

৪.১.১ কৌশল নির্ধারণ করতে নয় প্রশ্নের মডেল

সামগ্রীক কর্ম-কৌশল হলো বৃহৎ একটা কিছু যা অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমকে একটা পরিষ্কার লক্ষ্যের দিতে ধাবিত করে। কর্ম-কৌশল নির্দশ করে— সামগ্রীকভাবে আমরা কোথায় আছি, কোথায় যেতে চাই এবং কিভাবে তা পেতে পারি। মূলত কার্যকরী একটি কর্মকৌশল নয়টি মূল বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত:

ক. বাইরের পরিবেশ বিশ্লেষণ করে কৌশল নির্ধারণ করা

এক. আমরা কি চাই (উদ্দেশ্য) : যে কোন অ্যাডভোকেসি প্রক্রিয়া একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিচালিত হয়। উদ্দেশ্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। এছাড়া বিষয়ভিত্তিক ও পদ্ধতিগত উদ্দেশ্য হতে পারে।

দুই. কাদের কাছে অ্যাডভোকেসির জন্য যাওয়া হবে : দাবী আদায়ের জন্য কোন কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্টানের কাছে যেতে হবে তা নির্ধারন করতে হবে। যারা প্রকৃত অর্থ নীতি তৈরিকারী ও পরিবর্তন সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম তাদের কাছে অ্যাডভোকেসির বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে হবে।

তিন. কর্তৃপক্ষের জন্য কি কি সংবাদ বা তথ্য রাখতে হবে : সুনির্দিষ্ট করে কতৃপক্ষ বা শ্রোতার জন্য উপযোগী, হৃদয়গ্রাহী তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।

চার. বিশেষ বার্তাটি কে পৌছাবে : একই বার্তা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে হয়। কাজেই যিনি এই বার্তা পৌছাবেন তাকে তথ্যের ভিত্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সাবলীল হতে হবে।

পাঁচ. কীভাবে অ্যাডভোকেসির বিষয়গুলো টার্গেট গ্রুপের কাছে গ্রহনযোগ্য করা যায় : বিভিন্ন উপায়ে এই কাজ করা যেতে পারে— লবিং থেকে শুরু করে ক্যাম্পেইন বা প্রত্যক্ষ অ্যাকশন সব কিছুই হতে পারে ।

খ. ভিতরের পরিবেশ বিশ্লেষণ করে কৌশল নির্ধারণ করা

এক. আমাদের কি আছে (সম্পদ) : পূর্ব অভিজ্ঞতা বা সংগৃহিত জ্ঞানের ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি নিয়োজিত জনবল তথ্য ও প্রজ্ঞা এক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে।

দুই. আমাদের কি করতে হবে : সম্পদ নির্ধারনের পর নির্ধারন করতে হবে, আমাদের কি নেই, তা পর্যালোচনা করে এক্ষেত্রে করনীয় নির্ধারন করা।

তিন. আমরা কিভাবে শুরু করব : কৌশল বাস্তবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ, পন্থা ও কমৃসূচী নির্ধারন করা। কিছু সম্ভাবনাময় এবং স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্য বা কাজ নির্ণয় করা। যেমন— বাছাই করা কিছু কর্মীকে সংঘবদ্ধ করা।

চার. সামগ্রীক কৌশল মূল্যায়ন : গৃহীত কৌশলটি কার্যকরী কিনা তা নিরূপন করা অতি জরুরি । এক্ষেত্রে কৌশল অনুযায়ী কাজ শুরু করার পর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করে কৌশলে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন। যেমন— আমরা কি সঠিক টার্গেট গ্রুপ বা শ্রোতা নির্ধারণ করেছি? আমরা কি তাদের কাছাকাছি পৌছাতে পেরেছি, তারা কি আমাদের ইস্যুতে আলোচনায় অংশ নিতে রাজি হয়েছে বা হচ্ছে প্রভৃতি।

৪.১.২ অ্যাডভোকেসির সামগ্রিক কর্মকৌশলের ভিত্তিতে পরিকল্পনা তৈরি করা

প্রথম স্তর	নীতিমালা তৈরি করা → ↓	• ইস্যু চিহ্নিত করা • মূল ভূমিকা কার তা চিহ্নিত করা • পলিসি পরিবেশ বিশ্লেষণ করা • পাওয়া তথ্য সংক্ষিপ্ত করা
দ্বিতীয় স্তর	কাজের খসড়া কৌশল তৈরি করা→ ↓	• ইস্যু নির্ধারণ করা • টার্গেট অডিয়েন্স নির্ধারণ করা • লক্ষ্য নির্ধারণ করা • সহযোগী ও বিরোধী পক্ষ চিহ্নিত করা
তৃতীয় স্তর	কাজের কৌশল চূড়ান্ত করা→	• কী করতে হবে তা নির্ধারণ করা • মূল বক্তব্য নির্ধারণ করা

	↓	● কীভাবে কাজটি হবে তা চূড়ান্ত করা
চতুর্থ স্তর	পরিকল্পনা তৈরি⟶	● কতটুকু সময় লাগবে তা নির্ধারণ করা ● বাজেট তৈরি করা ● পর্যবেক্ষন ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা

৪.২ টুলস নির্বাচন করা

অ্যাডভোকেসী কোন একক কৌশল নয় বরং অনেকগুলো কৌশলের সমষ্টি এই কৌশল গুলোকে অ্যাডভোকেসীর উপাদান / হাতিয়ার (অ্যাডভোকেসি টুল) বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে অ্যাডভোকেসী পরিচালিত হয়। যে যে বিষয়গুলো অ্যাডভোকেসীর উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে সেগুলো হলো—

● সেমিনার/ওয়ার্কশপ	কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সমস্যা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া ; এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ ব্যাক্তির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের দলীয় আলোচনা অপরিহার্য
● সংলাপ	আইনজীবী ও অন্যান্য পক্ষের মধ্যে নিদির্ষ্ট ইস্যুভিত্তিক মতবিনিময়ের প্রক্রিয়া; পক্ষগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে কখনো একই ধরণের মতামত থাকতে পারে, আবার কোনো পক্ষ ভিন্নমতও প্রকাশ করতে পারে
● সভা / মতবিনিময়	এ কাজটি অ্যাডভোকেসির শুরুতে অথবা শেষ পর্যায়ে করা যায়; এক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের অংশগ্রহণ থাকলে অ্যাডভোকেসীর ফলাফল অর্জন সহজতর হয়
● ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট	আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক পরিসরে অ্যাডভোকেসি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে এটি খুবই কার্যকরী। একে ই-অ্যাডভোকেসিও বলে; তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রচার এবং বিশ্বজুড়ে জনমত তৈরীর জন্য ই-অ্যাডভোকেসি যথেষ্ট কার্যকর
● মিছিল / মৌন মিছিল / র‌্যালী	এই তিনটিই আবেদনময় যা কম খরচে ও টার্গেটভুক্ত লোকজনকে নিয়ে করা যায়; স্থানীয় পর্যায়ে দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে মিছিল/মৌন মিছিল/র‌্যালী বেশ কার্যকর
● মানববন্ধন	বহু মানুষের পক্ষে কোনো ইস্যুতে দেশের কোন বিশেষ এলাকার জনসাধারণের হাতে হাত ধরে একমত প্রকাশ করে নীতি তৈরিকারীদের প্রভাবিত করা যায়; এই পদ্ধতির সুবিধা হচ্ছে এটি অহিংস ও এতে খরচ কম হয়। এছাড়াও এটি সবার চোখে পড়ে, যাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়

• ক্যাম্পেইন	পোস্টার, লিফলেট, মাইকিং , রিপোর্টিং মিডিয়া প্রচার, ডকুমেন্টারি ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে জনগণের সচেতনতা বাড়ানো ও উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব
• প্রেস ব্রিফিং / কনফারেন্স	অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শুরুতে কেন এ ইস্যুটি নিয়ে অ্যাডভোকেসি করা হবে সে বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে জানানো
• সক্ষাৎকার/ রিপোটিং / গবেষণা	অ্যাডভোকেসির শুরুতে কোন ইস্যু সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা, রিপোর্টিং বা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে
• প্রকাশনা / ডকুমেন্টারি	অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইনের জন্য ইস্যুভিত্তিক প্রকাশনা বা বিভিন্ন ডকুমেন্টারি প্রকাশ ও প্রচার করা যেতে পারে
• স্মারকলিপি / চিঠি	কোনো সেমিনার, কনফারেন্স কিংবা জনসমাবেশের পর নীতি তৈরিকারীদের কাছে এর ফলো আপের অংশ হিশাবে স্মারকলিপি বা চিঠি দেয়া যেতে পারে
• স্বাক্ষরসংগ্রহ	কোনো ইস্যুর পক্ষে ব্যাপক জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা গেলে তাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে নীতি তৈরিকারীদের কাছে পাঠানো যেতে পারে
• উদ্বুদ্ধ করা	সমাজের জনগনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি এবং উদ্দেশ্য অর্জন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রভাবিত করা
• জনশুনানি	নীতি তৈরিকারীদের সঙ্গে সব ধরণের মানুষের সরাসরি মতবিনিময় করা
• আইনি মামলা	যারা কোনো বিশেষ নীতি বা আইনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তারা সরাসরি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন
• জনস্বার্থে মামলা	আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষ হয়ে তৃতীয় ব্যক্তি বা পক্ষ যখন মামলা দায়ের করে
• সমঝোতা / দরকষাকষি	কোনো একটি ইস্যুর পক্ষে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নীতি তৈরির জন্য চাপ প্রয়োগ করা
• অনশন / অবরোধ/ঘেরাও	অধিকার আদায়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে অনশন , অবরোধ , ঘেরাও প্রভৃতি পথ গ্রহণ করা হয়
• সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	কোনো ইস্যুতে জনগণকে সচেতন করতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে
• নেটওয়ার্ক	নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দল, সংগঠন এবং ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ সম্পর্ক স্থাপন, পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা
• মৈত্রী / মোর্চা	ব্যক্তি , দল বা প্রতিষ্ঠান কোনো ইস্যু নিয়ে রাষ্ট্র, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি বা সন্ধির মাধ্যমে একতাবদ্ধ হয়
• কোয়ালিশন	একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেয়ার প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান , রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির একতাবদ্ধ হওয়া যেখানে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ অবস্থান বজায় থাকে
• লবিং	নীতি তৈরিকারীদের প্রভাবিত করার জন্য যোগাযোগ প্রক্রিয়া

৪.৩ বাজেট তৈরি করা

অ্যাডভোকেসীর জন্য বাজেট নির্ধারন একটি জটিল কাজ। অ্যাডভোকেসীর মধ্য পর্যায়ে বাস্তবতার ভিত্তিতে কৌশল পরিবর্তিত হতে পারে। তখন স্বাভাবিকভাবেই বাজেটে ব্যপক পরিবর্তন হতে পারে। আবার অনিচ্ছাকৃতভাবেও প্রোগ্রাম পিছিয়ে যেতে পারে। এতেও খরচ বৃদ্ধি পায়।

অ্যাডভোকেসীর কৌশল নির্ধারনের ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, কম খরচের কোন কার্যক্রম হাতে নিলে যদি লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় তাহলে সেটিকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। বাজেট চূড়ান্ত করার সময় কাজের জন্য মোট নির্ধারিত খরচের বাইরের কিছু খাত থেকে কিছু বরাদ্দ বাজেটের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রাখা ভালো।

৪.৪ অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইনের পরিকল্পনা তৈরি করা

একটি সুবিন্যস্ত ও ব্যবহারোপযোগী ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা প্রনযন করতে গেলে তার অনেক উপাদান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা থাকা জরুরী। নিচে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ উপাদানগুলো উল্লেখ করা হলো—

• ইস্যু
• অ্যাডভোকেসির পরিবেশ
• যে নীতি তৈরির জন্য অ্যাডভোকেসি করা হবে
• ক্যাম্পেইন টার্গেট
• অ্যাডভোকেসি কৌশল
• কাজের পরিকল্পনা
• মনিটরিং ও মূল্যায়ন

ক.ইস্যুঃ সাধারণত যে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন বা অ্যাডভোকেসী করা হয়, তার সুনির্দিষ্ট ইস্যুএখানে উল্লেখ করতে হবে।

এক. পটভূমি : এখানে ইস্যুর প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান সমস্যা সম্পার্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা থাকবে।

দুই. যৌক্তিকতা : এখানে যে নির্দিষ্ট ইস্যু গ্রহন করা হয়েছে তার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে হবে।

খ. অ্যাডভোকেসীর পরিবেশ : এখানে বর্তমান অবস্থা SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) ও কোন কোন পর্যায়ে কার সাথে কাজ করতে হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

শক্তি	দুর্বলতা	সুযোগ	ঝুঁকি
• দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নিবেদিত টিম • পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা • আধুনিক তথ্যসংগ্রহ ব্যবস্থা • উন্নত গবেষণা পদ্ধতি • কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা • প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	• পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব • অভিজ্ঞ কর্মীর অভাব • পর্যাপ্ত অ্যাডভোকেসি উপকরণের অভাব • পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব	• জাতীয় শিল্প নীতির ঘোষণা • শিল্পের বিকাশে জনগণের আগ্রহ	• মধ্যস্বত্বভোগী • দুর্নীতিবাজ আমলা

গ. যে নীতি তৈরির জন্য অ্যাডভোকেসি করা হবে :

এক. বিদ্যমান জননীতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং বাস্তবায়নের উপায় উদ্ভাবন— বিদ্যমান সরকারী নীতি কার্যকর না থাকার কারন এবং কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তবায়ন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে।

দুই. বিকল্প জননীতি বিশ্লেষন— প্রস্তাবিত বিকল্প নীতি বিশ্লেষণ দিতে হবে অর্থাৎ এর ফলে সমাজে কি ধরণের প্রভাব পড়বে তার উল্লেখ থাকবে।

তিন. অ্যাডভোকেসি ফোকাস— যেই ইস্যুতে অ্যাডভোকেসি করা হবে তার ফোকাস কি তা নির্ধারণ করা অর্থাৎ এর ফলে কি কি বদল হবে বা সংযোজন হবে তা বলা।

চার. উপযুক্ত নীতি প্রনয়ন হলে কারা কিভাবে লাভবান হবে। উদাহরণস্বরূপ—

কাদের লাভ হবে?	কীভাবে লাভ হবে?
ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা	জামানত ছাড়া ঋণ পাওয়া গেলে শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে লাভবান হবেন

ঘ. ক্যাম্পেইন টার্গেট : ক্যাম্পেইন কাদের সাথে করা হবে। যেমন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় বা শিল্প মন্ত্রনালয়।

ঙ. অ্যাডভোকেসি কৌশল : কী ধরনের কৌশল নিলে ইস্যু বাস্তবায়ন সহজ হবে তা নির্ধারন করা। যেমন- কোয়ালিশন, মিডিয়া অ্যাডভোকেসী , মানব বন্ধন ইত্যাদি।

চ.   কর্ম-পরিকল্পনা : কাজটি বাস্তবায়ন করতে কতো সময়, কী পরিমান অর্থ ব্যয় হবে এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি কে হবেন, তা নির্ধারন করা। উদাহরণ—

কী কাজ?	কখন?	কোথায়?	কীভাবে?	কার দয়িত্ব?
সাংবাদিক সম্মেলন	১৮ জুন ০৬	জাতীয় প্রেস ক্লাব	প্রেসক্লাবের সাথে যোগাযোগ করে	অ্যাডভোকেসি গ্রুপ
পোষ্টার, লিফলেট, স্টিকার তৈরী ও ব্যবহার	২ মে- ২ জুন ০৬	দেশব্যাপী	ছাপানো এবং ব্যাবহার	অ্যাডভোকেসি গ্রুপ
------	------	------	------	-------

৪.৫ অ্যাডভোকেসি মনিটরিং ও মূল্যায়ন

মনিটরিং হচ্ছে কোনো কাজ কীভাবে চলছে তার ওপর নজর রাখা। কোনো প্রকল্পের নির্দিষ্ট সময় পর প্রাপ্ত ফল সন্তোষজনক কি না তা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে যাতে আরো ভালো করা যায় সে সম্পর্কিত নির্দেশনা দেয়াই হচ্ছে মূল্যায়ণ।

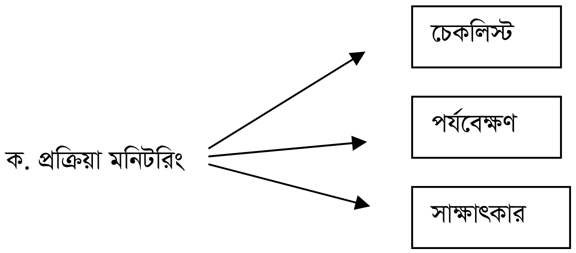

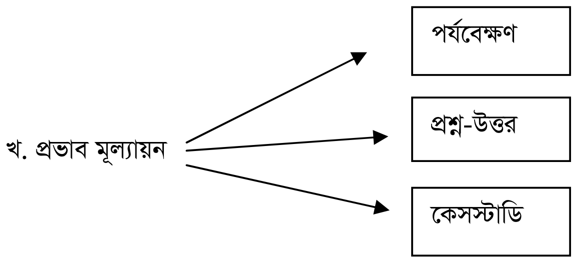

কেস স্টাডি : ওমর ফারুক, দুধ প্রক্রিয়াজাত করায় অভিজ্ঞ, ঠাকুরগাঁও

ওমর ফারুক বন্ধনে যোগ দেয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন। বন্ধন দিনাজপুরে অবস্থিত তার বোনের প্রতিষ্ঠান। বোন নাসিমা একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, তিনি জ্যাম, জেলী, আচার তৈরি করেন। ওমর ফারুক 'হ্যাডস' নামক একটি বিদেশী এনজিওতে চাকরি করেছেন ১২ বছর। সেই এনজিও ডেয়ারী ফার্ম করেছিল ঠাকুরগায়ে। কিন্তু দুধ বিপনন করা নিয়ে তারা বিরাট সমস্যায় পড়েন। দুধ বিক্রি হত না, ৪ টাকা লিটার দরে বিক্রি করতে হতো। তখন তারা চিন্তা করেন দুধ থেকে পনির বানিয়ে ঢাকায় সরবরাহ করবেন। তখন একজন বিশেষজ্ঞ দরকার হলো। তারা ঢাকায় এসে বিভিন্ন এনজিওর সাথে যোগাযোগ করে ডেনমার্কের একজন বিশেজ্ঞের সাথে চুক্তি করে তাকে ঠাকুরগায়ে নিয়ে যান। সেখানে ১ মাস গবেষণা করে তিনি রপ্তানীযোগ্য মোজারেলা চীজ তৈরীতে সফল হন। তারপর তারা শেরাটন হোটেলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন যেখানে পনিরের সম্ভাব্য ক্রেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সবাই তাদের তৈরী পনির খুব পছন্দ করে। তখনই তারা বেশ কিছু অর্ডার পেয়ে যান।

এরপর ফারুক সাহেব '৯৮ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটি এনজিও গঠন করেন। তারা ক্ষুদ্র ঋণ দিত। তারপর সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ঠাকুরগাঁয়ে একটি দুধ প্রক্রিয়াকরন কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু তিনি পনির তৈরীর সব কৌশল আগেই শিখে নিয়েছিলেন, তাই তিনি এই ব্যবসাটার চিন্তা করেন। তিনি নিজে ঢাকায় যেয়ে পিজা হাট, ডোমিনোস পিজা, উইম্পি ইত্যাদি ফাস্ট ফুডের দোকানে চিজ সরবরাহ শুরু করেন। তারা তার পরিচিত ছিল এনজিওর দুধ বিপননের সূত্রে। কিন্তু দেখা গেল প্রতি মাসে কয়েকদিন ঢাকায় থাকলে ওদিকে কারখানায় কাজ ঠিকমত হয় না, দুধ চুরি হয়। আবার তিনি ঢাকায় না আসলে মার্কেটিং ঠিকমত হয় না। তখন তিনি বিক্রয় এজেন্ট খুজতে লাগলেন। তিনি '৯৯ সাল থেকে কম থেকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে এখন দিনে গড়ে ৫০ কেজি মোজারেলা চীজ উৎপাদন করে আসছেন। ডোমিনোস পিজার দোকানে তার ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা পাওনা আছে। বিক্রয় প্রতিনিধি খুজতে গিয়ে তিনি প্রথমে গুলশানে ধানসিড়ির পিছনে একটা ফাস্ট ফুডের দোকানের মালিকের সাথে আলাপ করেন, তার নাম সাব্বির আহমেদ। তার সাথে কয়েকদিন আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত তার সাথে চুক্তি হয় নাই। তারপর তিনি বনানী আওয়াল সেন্টারে অবস্থিত এজাব গ্রুপের সাথে তিনি চুক্তি করেন।

ফারুক সাহেব তার পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেন এবং চুক্তিতে লেখা থাকে যে, কাঁচামালের দাম যদি শতকরা ১০ ভাগের বেশী বৃদ্ধি পায় তবে পনিরের দাম পুনরায় নির্ধারণ করা হবে। তারা ৬ মাসের টাকা অগ্রিম দিয়ে রেখেছিল । এই অবস্থায় কাঁচামালের দাম বাড়তে বাড়তে শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত বেড়ে গেল কিন্তু তাদের বার বার বলা সত্বেও তারা পনিরের দাম বাড়ালো না। তারা বলল যে পরে আপনার সাথে বসে অগ্রিমের সাথে বাড়তি দাম সমন্বয় করে দেয়া হবে, আপনি সরবরাহ দিতে থাকুন। এভাবে ৪/৫ মাস দেয়ার পর দেখা গেল তারা বর্ধিত মূল্য দিচ্ছে না। তখন ফারুক সাহেব বললেন যে, যখন থেকে কাঁচামালের দাম বেড়েছে, তখন থেকে পনিরের বর্ধিত মূল্য না দিলে তিনি উৎপাদন বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাবসায়িক সুবিধার কথা চিন্তা করে তার আগেই ফারুক সাহেব তার কারখানা স্থানান্তর করেছিলেন বিক্রয় এজেন্টের জমিতে। ফলে পনির উৎপাদন বন্ধ হয় নাই বরং তাদের ব্যবস্থাপনায় চলতে থাকে। ঠাকুরগাঁও চেম্বার অব কমার্স, যেখানে ফারুক সাহেব একজন সদস্য, সেখানে তিনি অভিযোগ দায়ের করেন। তারা বিচার করে একটা সিদ্ধান্ত দেন, কিন্তু তাতে দেখা যায় চেম্বার বিক্রয় এজেন্টের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করেছে। যেখানে সঠিক হিসাব করে পনিরের মূল্য নির্ধারণ করে দিলে ফারুক সাহেবের ৪০/৪৫ হাজার টাকা পাওয়ার কথা, সেখানে রায়ে বলা হয়েছে যে, অগ্রিম নেয়া ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা

ফারুক সাহেব ফেরৎ দিয়ে তার মেশিনারিজ তিনি নিয়ে যেতে পারেন। তার উপর ৮ মাস যাবৎ তার মেশিন, যার মূল্য প্রায় সাড়ে সাত লাখ টাকা, তা বিক্রয় এজেন্টরা ব্যাবহার করে ব্যবসা করছে। তার জন্য ফারুক সাহেবের ক্ষতিপূরন পাওয়া উচিৎ। নিরুপায় হয়ে ফারুক সাহেব তাদের রায় মেনে নিয়েছেন। আর একদিন পর তারিখ দেয়া আছে তিনি টাকা দিয়ে মেশিন ফেরত নিয়ে আসবেন। তারপর তিনি দিনাজপুরে তার কারখানা স্থাপন করবেন এবং বন্ধনের নামেই তার পনির বিক্রি শুরু করবেন। তিনি নিশ্চিত যে মানের দিক দিয়ে বাংলাদেশে কেউ তাকে অতিক্রম করতে পারবে না। ফলে এজাব গ্রুপকে তিনি পরাজিত করবেন মার্কেটিং এ। ঢাকায় লা ভিঞ্চি, শেরাটন, এইসব বড় বড় হোটেল, সেরা ফাস্ট ফুডের দোকানে তার ব্যাপক পরিচিতি আছে। তিনি উৎপাদন শুরু করলে তার আগের কর্মচারীরা সবাই তার কাছে চলে আসবে, আর না আসলেও ক্ষতি নেই, মোজারেলা চীজ তৈরীর গোপন কৌশল ফারুক সাহেবের জানা আছে। তিনি নতুন লোক দিয়ে কাজ করতে পারবেন। কাজেই আগামী প্রকল্প নিয়ে তারা দুই ভাই বোন খুব আশাবাদী। নাসিমা বেগমের স্বামীও তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ওমর ফারুকের ব্যবসা প্রসারের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—
তার মার্কেটিং এজেন্টের সাথে ন্যায়সংগতভাবে বিবাদ নিরসন। এক্ষেত্রে তার একটি ভুল হয়েছিল, তার মেশিনপত্র এজেন্টের জমিতে স্থাপন করা। ঠাকুরগাও চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি যে রায় দিয়েছে, তা যদি ন্যায়সংগত হয় নাই বলে ফারুক সাহেব মনে করেন, তবে তার উচিত অ্যাডভোকেসী টুলস্ অনুসরণ করা। এক্ষেত্রে টুলস্গুলো হতে পারে আইনি মামলা, কিংবা জনস্বার্থে মামলা করতে উপযুক্ত কাউকে উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়াও ফারুক সাহেব ঠাকুরগাওয়ের বিভিন্ন দুগ্ধ উৎপাদনকারী এবং প্রক্রিয়াকারীদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এজাব গ্রুপকে বর্জন করার পদক্ষেপ নিতে পারতেন। যেহেতু তারা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছিল। এর ফলশ্রুতিতে তার সমস্যার ফলপ্রসূ সমাধান হতো বলে আশা করা যায়।

এই অধ্যায়ে যা আছে

মিডিয়া অ্যাডভোকেসি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, প্রক্রিয়া নির্ধারণ, পরিকল্পনা তৈরির ধাপসমূহ, কৌশল চূড়ান্ত করায় বিবেচ্য বিষয়গুলো, টুলস নির্বাচন।

পঞ্চম অধ্যায়

মিডিয়া অ্যাডভোকেসি

৫.০ ভূমিকা

আইন, নীতিমালা ও বিধি-বিধান বাস্তবায়ন, সংস্কার বা পরিবর্তন অথবা নতুন পলিসি প্রনয়নের জন্য গনমাধ্যমের কৌশলগত ব্যবহারই হচ্ছে মিডিয়া অ্যাডভোকেসি ।

মিডিয়াতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্ভাবনা ও জাতীয় অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব উপস্থাপন করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করা সহজ হয়।

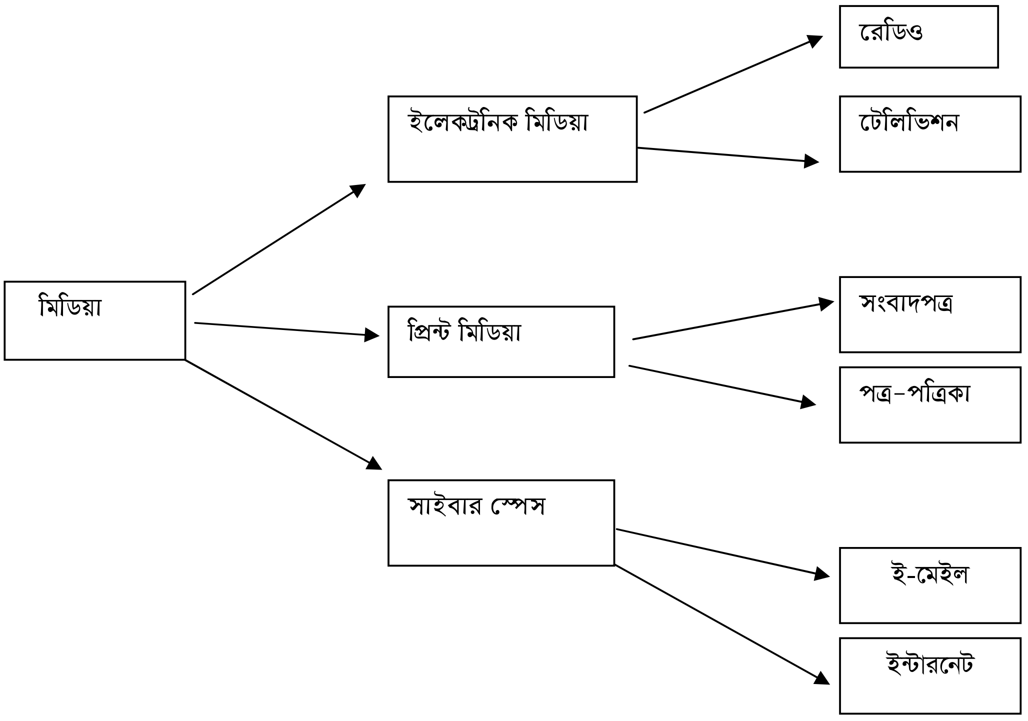

৫.১ পদ্ধতি নির্ধারণ করা

মিডিয়া অ্যাডভোকেসির প্রথম কাজ হলো বার্তা / অনুষ্ঠান তৈরি এবং কৌশলপূর্ণ উপস্থাপন । এটি যখন ব্যাপক আলোচিত হয় , নানা মহলে সাড়া জাগায় তখন অ্যাডভোকেসি গ্রুপকে নিয়ে সরাসরি নীতিনির্ধারকদের সাথে যোগাযোগ করলে কাঙ্খিত ফলপ্রাপ্তি সহজ হয়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সংক্রান্ত অ্যাডভোকেসীর কাজে আমরা প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া উভয়টিকেই ব্যবহার করতে পারি।

৫.২ পরিকল্পনা তৈরি করা

মিডিয়া অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত ধাপগুলো মেনে চলা যেতে পারে—

●	সমস্যা চিহ্নিত করা
●	লক্ষ্য চিহ্নিত করা
●	নীতি কে তৈরি করছে এবং ফল কে ভোগ করছে তা চিহ্নিত করা
●	বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা
●	কার্যকর যোগাযোগ কীভাবে হবে তা চিহ্নিত করা
●	কাজ সুনির্দিষ্ট করা
●	অ্যাডভোকেসির জন্য মিডিয়া বাছাই করা
●	প্রশিক্ষণের প্রয়োজন কেমন তা যাচাই করে প্রশিক্ষণ দেওয়া
●	বার্তা প্যাকেজ তৈরি করা
●	বার্তার ফিল্ড টেস্ট করা
●	সময় বেঁধে নেওয়া
●	বার্তা প্রচার করা
●	ফিডব্যাক দেখা
●	মূল্যায়ন করা
●	প্রয়োজনে কৌশল আবার নির্ধারণ করা
●	প্রয়োজনে প্রক্রিয়া আবার চালিয়ে যাওয়া

৫.৩ কৌশল চূড়ান্ত করা

কৌশল চূড়ান্ত করতে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করার দাবি রাখে—

• গনমাধ্যম সম্পর্কে ধারণা লাভ করা
• মিডিয়ার প্রবেশ ক্ষমতা বাড়ানো
• ইস্যু অনুযায়ী সংবাদ তৈরি করা
• সুনির্দিষ্ট ইস্যুর উপর তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করা
• সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা
• সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠক করা
• সংবাদ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়া
• স্মারকলিপি তৈরি করা
• সাংবাদিকদের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন

৫.৪ টুলস নির্বাচন করা

• প্রেস রিলিজ— অ্যাডভোকেসির মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে প্রেস রিলিজ করা
• ভিডিও নিউজ রিলিজ— প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া বক্তব্যকে ভিডিও আকারে তৈরি করে সংবাদ সংস্থাগুলোতে পাঠিয়ে দেওয়া
• প্রেস কনফারেন্স— অ্যাডভোকেসির মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ সহকারে উপস্থাপন করার জন্য সাংবাদিকদের নিয়ে সম্মেলন করা
• অংশগ্রহণমূলক ভিডিও— সম্পর্কিত লোকজনকে দিয়ে ভিডিও তৈরি করে নির্দিষ্ট সমস্যাকে তুলে ধরা

এই অধ্যায়ে যা আছে

কোয়ালিশন, নেটওয়ার্ক, কৌশলগত পার্টনারের সংজ্ঞা, গঠন প্রক্রিয়া, গঠনকালে বিবেচ্য বিষয়, গঠনের সুবিধা-অসুবিধা এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা

ষষ্ঠ অধ্যায়

কোয়ালিশন, নেটওয়ার্ক ও কৌশলগত পার্টনার

৬.০ ভূমিকা

কোয়ালিশন বা নেটওয়ার্ক বিভিন্নমুখী শক্তি ও সম্পদকে সংঘবদ্ধ করে এবং বৃহত্তর শক্তিতে পরিণত হয়ে অ্যাডভোকেসিকে সার্থক করে তোলে। অবশ্য, এ ধরণের মৈত্রী বা প্ল্যাটফরম টিকিয়ে রাখা অনেক সময় বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। এই এই পরিচ্ছেদে এদের বৈশিষ্ট, গতি প্রকৃতি এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

সাধারণত মনে করা হয় যে, এ ধরণের প্ল্যাটফরমে সমমনা সংগঠনগুলো বা একই ইস্যুতে জোটবদ্ধ সবাই বিভিন্ন বিষয়ে একমত হয়ে কাজ করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না, অনেক বিষয়ে দ্বিমত ও দ্বন্দ দেখা দেয়। এখানে বোঝার সুদিধার্থে কোয়ালিশন, অ্যালায়েন্স ও নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে তাদের সংজ্ঞা ও ধারণা দেওয়া হলো। অন্যভাবে বললে বলা যায়, বাস্তবে নেটওয়ার্কের মধ্যে কোয়ালিশনের কোয়ালিশনের মধ্যে নেটওয়ার্কের বা অ্যালায়েন্সের বৈশিষ্ট বিদ্যমান দেখা যায়।
কোয়ালিশন— তত্ত্বগতভাবে কোয়ালিশন সাধারণত আনুষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হয়। এর পৃথক অফিস ও সার্বক্ষণিক স্টাফ থাকে। এখানে সদস্যদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।

নেটওয়ার্ক— তত্ত্বগতভাবে নেটওয়ার্ক সাধারণত নমনীয় কাঠামোর হয়ে থাকে এবং ঢিলেঢালাভাবে পরিচালিত হওয়ার কথা। এখানে সমমনা লোকজন বা একই ধরণের প্রতিষ্ঠান কোন বিষয়ে একই স্বার্থে দলবদ্ধ হয়ে তথ্য ও ধারণা বিনিময় করে থাকে। যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কখনো কখনো নেটওয়ার্কের গঠন ও পরিচালনা প্রক্রিয়া অনেকটা ভন্নিরকম দেখা যয়। আবার কোন কোন নেটওয়ার্কের বেতনভূক্ত কর্মচারিও থাকে।

অ্যালায়েন্স— অ্যালায়েন্স বা মোর্চা বা মৈত্রী সাধারণত স্বল্পকালীন সময়ের জন্যে গঠিত এবং একটি সুনির্দিষ্ট ইস্যু বা উদ্দেশ্যকে ঘিরে পরিচালিত হয়। সীমিত মসয় ও উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হওয়ার কারণে সদস্যদের উপর তেমন দীর্ঘমেয়াদী কাজের চাপ থাকে না।

৬.১ কোয়ালিশন

কোয়ালিশন হচ্ছে একই সামাজিক লক্ষ্যে পৌছার জন্যে পারস্পরিক সহযোগীতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্লাটফরম। অ্যাডভোকেসি প্রচেষ্টার অন্যতম কৌশল হচ্ছে কোয়ালিশন গঠন। এখানে নিজস্ব সেক্টরের বাইরের গ্রুপের সাথেও সংযোগ গড়ে তোলা হয়। একই সেক্টরের বিভিন্ন অংশের কোয়ালিশন গড়ে উঠতে বেশ সময় নেয়। কারণ, এক পক্ষ আরেক পক্ষকে বুঝে উঠতে, আস্থা গড়ে তুলতে সময় লাগে। কোয়ালিশনে অনেক সময় প্রত্যেকেরই অনেক সময় সমান ক্ষমতা ও সম্পদ থাকে না। তাই এতে কর্তৃত্ব নিয়ে টেনশন দেখা দিতে পারে। তাই কোয়ালিশন গড়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। স্বাভাবিক গতিতেই তাকে গড়ে উঠতে দেয়া দরকার।

কোয়ালিশন গঠনের কিছু সুবিধা- অসুবিধা নিচে আলোচিত হলো—

সুবিধা	অসুবিধা
• অ্যাডভোকেসিকে নির্দিষ্ট ইস্যুতে সমর্থনের ভিত্তি বাড়ানো, কারণ একার পক্ষে যা অসম্ভব, দশজনের পক্ষে তা সম্ভব • অ্যাডভোকেসি পরিচালনায় যে কোনো প্রচেষ্টার নিরাপত্তা বিধান করে • কোয়ালিশনে দায়িত্ব ভাগ করে এবং বিভিন্ন সম্পদকে একত্র করে বিদ্যমান সম্পদকে বাড়ানো যায় • অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইনের কর্মসূচি এবং আর্থিক শক্তিকেও বাড়ায় • নাগরিক সমাজকে শক্তিশালী করে, যার ফলে সফলতা সহজ হয় • অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইনের বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রভাব জোরদার করে। যা বিচ্ছিন্নভাবে সম্ভব নয় • নতুন নেতৃত্ব তৈরিতে সাহায্য করে	• নিজের অন্যান্য সাংগঠনিক কাজে প্রয়োজনীয় সময় দেয়ো না-ও হতে পারে • নিজ কৌশল এবং ইস্যু সম্পর্কে নিজের অবস্থানের সঙ্গে আপোষ করতে হতে পারে • ক্ষমতা যেহেতু সকল কোয়ালিশন সদস্যের মধ্যে সবসময় সমানভাবে ভাগ হয় না, ফলে বড় অথবা ধনী সদস্যদের বেশি প্রভাব থাকতে পারে, তাতে বড় প্রতিষ্ঠানের কাছে নতি স্বীকার বা তার সঙ্গে আপোষ করতে হতে পারে • ব্যক্তিগত কাজের অবদানের মূল্যায়ন নাও হতে পারে • কোয়ালিশন পদ্ধতি ভেঙ্গে গেলে অ্যাডভোকেসির ক্ষতির কারণ হয়, কারণ এতে ইস্যু ও সদস্যদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে

• নৈতিক মনোবল তৈরিতে ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোকে সাহায্য করে • কাজকর্মের পরিধি বাড়ায় • দক্ষতা, জ্ঞান ও শেখার বিষয় বিনিময় করার সুযোগ তৈরি হয় • আর্থিক অনুদান পেতে সাহায্য করে	

উপরে বর্ণিত সুবিধা-অসুবিধা নেটওয়ার্ক বা কৌশলগত পার্টনারশিপ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৬.১.০ কোয়ালিশনের শ্রেণীবিভাগ

ক. স্থায়ী— স্থায়ী কোয়ালিশন এক দল স্টাফ এবং পরিচালনা পরিষদ দ্বারা গঠিত। এতে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয় কাঠামোগত ও পদ্ধতিগতভাবে। সদস্যরা তাদের ফি পরিশোধ করে। অস্থায়ী ও অনানুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে স্থায়ী কোয়ালিশনে পরিণত হতে দু'বছরও লাগতে পারে। যেমন- অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন ইত্যাদি।

খ. অস্থায়ী কোয়ালিশন— একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনে অস্থায়ী কোয়ালিশন গঠিত হয়। লক্ষ্যার্জিত হলে কোয়ালিশন বিলুপ্ত হয়ে যায়। অনেক সময় কোয়ালিশন বহালও থাকতে পারে, যদি আরেকটি লক্ষ্য স্থির হয়।

গ. আনুষ্ঠানিক— নির্ধারিত চাঁদা দিয়ে সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে কোয়ালিশনে যোগদান করেন এবং নাম, ঠিকানাসম্বলিত চিঠি ও কোয়ালিশন ঘোষণা ইত্যাদি দ্বারা সদস্য হিসেবে স্বীকৃত হন।

ঘ. অনানুষ্ঠানিক— এখানে কোন অফিসিয়াল সদস্যপদ নেই, সুতরাং সদস্য প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে পারে। সদস্যপদ পারিবর্তনের সাথে সাথে ইস্যু ও কোশল পরিবর্তিত হতে পারে।

৬.১.১ কোয়ালিশনে অংশ নেওয়া

নিচের বিষয়গুলো কোয়ালিশনে যোগদানের আগে ও পরে মানা উচিত—

• যোগদানের আগে কোয়ালিশন কাদের দ্বারা পরিচালিত, সদস্য কারা, উদ্দেশ্য কী এবং তাদের আদর্শ ও অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে
• আপনার ও আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে কোয়ালিশন কী ধরনের আর্থিক এবং লোকবলের সমর্থন আশা করে তা পরিষ্কারভাবে জানতে হবে
• কোয়ালিশনে যোগদানের জন্য আপনার সংগঠনের যথেষ্ট সময় এবং সম্পদ আছে কি না তা ভেবে দেখতে হবে
• কোয়ালিশনে যোগদান করে আপনার সংস্থা কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে তা সঠিক ভাবে বের করতে হবে অর্থাৎ কোয়ালিশনে যোগদান আপনার জন্য লাভজনক কি না এবং কোয়ালিশনের মাধ্যমে আপনার লক্ষ্য অর্জন করার যথেষ্ট সুযোগ আছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে
• সভায় নিয়মিত যোগ দিতে হবে, সভায় যোগ না দিলে আপনার প্রয়োজন এবং অনুরোধ কোনোটির প্রতিই কোয়ালিশন সাড়া দেবে না, অর্থাৎ আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনার মত জানাতে ব্যর্থ হবেন

৬.১.২ কার্যকর কোয়ালিশন পরিচালনা করা

নতুন কোয়ালিশনের প্রথম সভাতেই কোয়ালিশন গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সদস্যদের কাছে প্রত্যাশা ও তাদের লাভ ইত্যাদি সাবলীল ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে। প্রত্যেক গ্রুপকে তাদের উপস্থাপনের জন্য এবং ইস্যু, লক্ষ, কৌশল সম্পর্কে তাদের মতামত দেয়ার জন্য আলোচ্যসূচিতে যথেষ্ট সময় বরাদ্দ রাখতে হবে। এরপর বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন ও গ্রুপ কোয়ালিশনে যোগদানে সম্মত হলে এর কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

কোয়ালিশন শক্তিশালী করতে এবং কার্যকরভাবে চালিয়ে যেতে কিছু পরামর্শ—

• কোয়ালিশনের প্রধান সদস্যদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখতে হবে, ইস্যু অর্জনে কোয়ালিশনের কাজকর্মের অগ্রগতি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় তাদেরকে অবগত করতে হবে। অনেক সংস্থা বা সদস্যরা নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন তথ্য যাতে কোয়ালিশনে দেয় তা নিশ্চিত করতে হবে, কারণ এক্ষেত্রে তথ্যপ্রবাহ অত্যন্ত জরুরি
• কোয়ালিশন সদস্যদের অবস্থান এবং মত সঠিকভাবে জানার জন্যে তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে

• স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য পূরণে সকল সদস্যের একমতে পৌছাতে হবে। উচ্চাকাঙ্খী উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করা যাবে না। লক্ষ্যবস্তু কোয়লিশনের পক্ষে অর্জনযোগ্য হতে হবে
• সাধারণ নীতি নির্ধারণে বিশেষ করে শক্তিশালী সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে কোনো কোনো গ্রুপকে হারানোর সম্ভাবনা থাকে
• বিভিন্ন কাজের জন্য কৌশলের দিক থেকে উপ-বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে কিন্তু এই সকল উপ-বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ও তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে
• কারো মন খারাপ হতে পারে ভেবে কোন সাংগঠনিক ইস্যু এড়িয়ে চললে হবে না, এগুলো সভায় খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে, মনে রাখতে হবে যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব

৬.২ নেটওয়ার্ক

কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে দল, সংগঠন বা ব্যক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ, সম্পর্ক স্থাপন, ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণযন ও বাস্তবায়নের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিস্তৃত পরিসরে কাজ করার ক্ষেত্র প্রস্তুতকেই নেটওয়ার্ক বলে। একই কমিউনিটির বিভিন্ন সমমনা অংশের মধ্যে সহমর্মিতা ও সংহতি গড়ে তোলার লক্ষে নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়। নেটওয়ার্কে স্বাধীনতা বেশী। ফ্যাক্স, ই-মেইল, প্রভৃতি প্রযুক্তি নেটওয়ার্কিংয়ে সহায়তা করে থাকে। একজন অ্যাডভোকেসি কর্মীর এগুলোর ব্যবহার জানা জরুরি।

৬.২.০ নেটওয়ার্কের পদ্ধতি

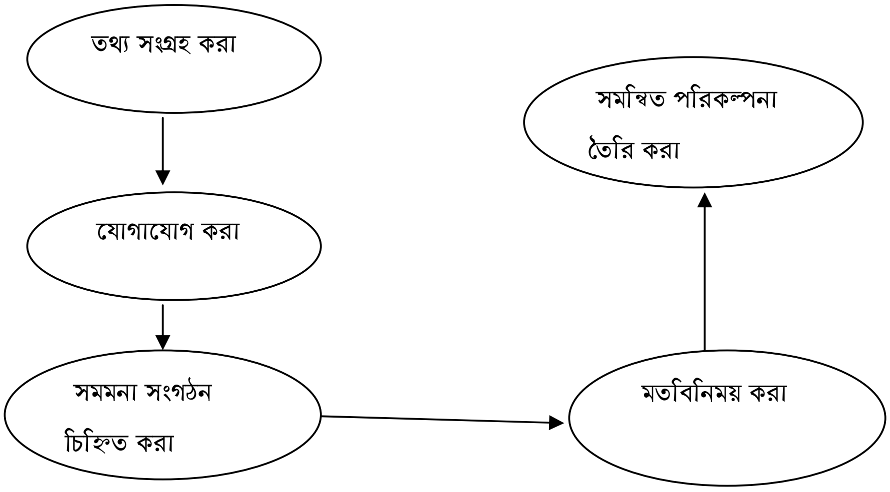

৬.২.১ *নেটওয়ার্ক বাস্তবায়ন করা*

নেটওয়ার্ককে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে অনেক সময় আপনাকে সহায়ক হিসাবে কাজ করতে হতে পারে। বিশেষ কের যদি নেটওয়ার্কের অধিকাংশ সদস্য তেমন দক্ষ না হয়, তখন আপনি এক্ষেত্রে কয়েকজন সমমনা ব্যক্তি নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন। স্থানীয় পর্যায়ে সমমনা অভিবাবক, শিক্ষক, ছাত্র নিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ শুরু করতে পারেন। এভাবেই কাজ করতে করতে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে পারে।

৬.২.২ *নেটওয়ার্কের কার্যকরিতা*

• উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সহজ হয়
• তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়
• বিভিন্ন দিক থেকে উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়
• দক্ষতা বাড়ে
• সাংগঠনিক শক্তি বাড়ে

নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে অ্যাডভোকেসির কার্যক্রমকে জোরাল করা সম্ভব হয়। তবে অনেক সময় এতে সমস্যাও তৈরী হয়। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করতে গেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রীতা তৈরী হতে পারে, মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। সতর্ক থাকতে হবে, আপনার সংগঠনের প্রোফাইল যেন নেটওয়ার্ক বিলুপ্ত না হয়। আপনার প্রচুর সময় ও শক্তি যাতে নেটওয়ার্কেই ব্যায় না হয়ে যায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আপনার ইস্যু যাতে নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌছাতে সহায়ক হয়, নেটওয়ার্ক সেভাবে পরিচালনা করতে হবে। তবে, এরকম দু'একটি সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নীতি-নির্ধারণী ক্ষেত্রে লবিং বা চাপ প্রয়োগ করতে নেটওয়ার্ক যথেষ্ট কার্যকরী; কাঙ্খিত পলিসি বদলের লক্ষে পৌছানোর জন্য যথেষ্ট ফলপ্রসূ।

৬.৩ কৌশলগত পার্টনার

অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমকে গতিশীল ও সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্জন করতে কৌশলগত পার্টনার নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইস্যু বাস্তবায়নের জন্যে বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কৌশলগত পার্টনার হিসেবে অ্যাডভোকেসি কর্মতৎপরতায় সম্পৃক্ত করা হয়। নীতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সময় ইস্যুসংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং ইস্যু বাস্তবয়নে কে কৌশলগত পার্টনার হবে তা নির্ধারণ করা যায়। এক্ষত্রে আপনাকে মুখ্য ভূমিকা নিতে হতে পারে। বৃহত্তর নেটওয়ার্ক, কোয়ালিশন ছাড়াও আপনি দু'একজন পার্টনারকে নিয়ে একসাথে একটি ইস্যু নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন। এক পর্যায়ে এই ক্ষুদ্র পার্টনারশিপের উদ্যোগে অন্যান্য নেটওয়ার্ককে সঙ্গে নিয়ে কাজ করা যেতে পারে, বা নতুন নেটওয়ার্ক বা কোয়ালিকশন বা অ্যালায়েন্স গড়ে তোলা যেতে পারে।

পার্টনারশিপ বা অংশীদারিত্ব শব্দটার মধ্যেই সমলক্ষ্যে, সমশক্তির অধিকারী, সমমর্যাদাসম্পন্ন গ্রুপ বা সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে বোঝায়। পার্টনারশিপ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য এক একটি পার্টনার এক একটি বিষয়ে অবদান রাখবে। উদাহরণস্বরূপ— কোন এনজিওকে কৌশলগত পার্টনার করা যেতে পারে, যাতে সে কোয়ালিশনের উদ্যোক্তাদের ব্যাংক ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে জামিনদার হতে পারে। আরেক পার্টনার অবদান রাখতে পারে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে। আরেক পার্টনার রাখতে পারে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে।

৬.৩.১ *কৌশলগত পার্টনার নির্বাচনে যা বিবেচনা করা দরকার*

ইস্যু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তাই কর্মতৎপরতা চালানোর জন্যে কৌশলগত পার্টনার নির্বাচনে সবসময় কিছু বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। কৌশলগত পার্টনার নির্বাচনে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। যেমন—

• একই ইস্যু নিয়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আগে বা বর্তমানে কাজ করছে কি না বা ইস্যু সম্পর্কে কারা জানে তা চিহ্নিত করা
• নির্দিষ্ট ইস্যুতে কে কতটুকু ভূমিকা রাখবে তা বিচার করা
• নির্দিষ্ট ইস্যু সম্পর্কে পার্টনারের ধারণা পরিষ্কার কি না তা বোঝা
• কীভাবে সে এই ইস্যুতে ভূমিকা রাখবে তা নির্দিষ্ট করা
• পারস্পরিক চাহিদাগুলো কী কী তা পরিষ্কার হওয়া দরকার
• যে লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে তার সঙ্গে একমত পোষণ করে এমন আরো ব্যক্তি, গ্রুপ বা সংগঠন রয়েছে কি না তা দেখা

অনেক খারাপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার প্রভাবের কারণে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে পারে। এদের অবস্থানও সমাজে পাকাপোক্ত। সুতরাং কৌশলগত পার্টনার নির্বাচনের সময় আপনার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত, এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা উচিত, যা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৬.৩.২ *কৌশলগত পার্টনারকে ইস্যুর পক্ষে আনার কৌশল*

কৌশলগত পার্টনারকে নিজের পক্ষে আনার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় মেনে চলা প্রয়োজন। যেমন—

• ইস্যু ও অ্যাডভোকেসির উদ্দেশ্য কী তা তাদের কাছে পরিষ্কার করা
• ইস্যু বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা
• উদ্দেশ্য নিয়ে মুখোমুখি আলোচনা করা
• ইস্যুটি কেন গুরুত্বপূণ তার পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরা
• ইস্যুর সঙ্গে আর কারা আছে তাদের পরিচয় দেওয়া
• ইস্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের অধিকার ও আপনার দায়িত্ব সম্পর্কে জানানো
• প্রয়োজনে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া
• অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা তৈরি করে দেওয়া
• প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা

একা একজন ব্যক্তি বা সংগঠনের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই, কৌশলগত পার্টনারকে রাজী করিয়ে কাজগুলো ভাগ করে এগিয়ে নেয়া সম্ভব। এভাবে কৌশলগত পার্টনার সৃষ্টি করে কাজের পরিবেশকে আরো সহজ করে তোলা যায়।

<u>কেস স্টাডি: ইমন, 'প্রিয়দর্শিনী'-র মালিক, ঘাষিপাড়া, দিনাজপুর</u>

ইমন তার বাবার বাড়িতে ছোট একটি কারখানা করেছেন। পাঁচ বছর যাবৎ কারখানাটি পরিচালনা করছেন। সেইসাথে প্রশিক্ষনও দিচ্ছেন মেয়েদের তার কারখানায় এবং বিভিন্ন এনজিওতে। তার কারখানায় শাড়ি, সালওয়ার কামিজ, ফতুয়া, পাঞ্জাবী, গেঞ্জিতে বিভিন্ন ধরনের এমব্রয়ডারি, ব্লক, বাটিক প্রিন্ট করা হয়। সেলাই, এমব্রয়ডারির কারখানা বাড়ির নীচতলার একটি বড় রুমে করা হয় আর ব্লক, বাটিকের কাজ বাড়ির ছাদের উপর করা হয়। ছাদের উপর চুলা আছে, বড় বড় মাটির হাড়ি আছে, আরো বিভিন্ন সরঞ্জাম আছে ব্লক, বাটিকের কাজ করার জন্য। নীচতলার রুমে ৬ টা সেলাই মেশিন আছে, তার মধ্যে একটি ইলেকট্রিক ইন্ডিয়ান এমব্রয়ডারি মেশিন, একটি সিঙ্গার ইলেকট্রিক পে্লন সেলাই মেশিন, বাকিগুলো কমদামী সেলাই মেশিন। ইমন দিনাজপুর সরকারী কলেজে মাস্টার্স ফাইনালে পড়েন।

যখন ঈদ বা পূজা সামনে থাকে তখন তার কারখানায় ১০/১২ জন কর্মী কাজ করে। কর্মীদের একেকটি কাজের জন্য কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মজুরি পরিশোধ করা হয়। মজুরি জামা প্রতি হালকা থেকে ভারী এমব্রয়ডারির জন্যে ৮০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। ঈদ , পূজা ছাড়া অন্য সময় কারখানায় কর্মী থাকে ৫/৬ জন। কর্মীরা অনেকে স্কুল কলেজের ছাত্রী,

আবার অনেকে বিভিন্ন কারনে মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এখানে কাজ শিখছে এবং আয় করছে। ইমন আইটি ডিজি থেকে প্রশিক্ষন নিয়েছিলেন। এখন তিনি বিভিন্ন এনজিওতে প্রশিক্ষন দেন।

বাটিকের চাহিদাটা একটু কম, কিন্তু ব্লকের চাহিদাটা বেশী। বাটিকে খরচটা একটু বেশী পড়ে। বাটিকের মধ্যে আবার কাঁথা স্টিচ করে নেয় ক্রেতারা। বিভিন্ন এনজিও তাকে মাঝে মাঝে প্রশিক্ষন দেয়ার জন্য ডাকে। তখন তিনি ১৫/১৬ জনের ব্যাচ করে ১/২ সপ্তাহ ট্রেনিং দেন। সেইসব প্রশিক্ষন প্রাপ্তরা, যাদের বেশীরভাগই ছাত্রী, প্রায়ই ইমনের কারখানায় আসে। তাদের মধ্যে যাদের সাথে ইমনের সম্পর্ক ভাল , তাদের তিনি লিফলেট দেন ২৫/৫০ টা করে। তারা সেগুলি বিভিন্ন স্কুল কলেজে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিলি করে। এইভাবে তার প্রচার কাজ চলে। ক্রেতারা সরাসরি কারখানায় এসে পছন্দমত পণ্য কিনে নিয়ে যান। তাছাড়া পূজা ও ঈদের আগে মাইকিং করে থাকেন। সামনে বৈশাখী মেলায় তিনি স্টল নিবেন। তার জন্য এখন পোষাক তৈরীর কাজ চলছে। ঢাকায় গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে কাপড় ও ক্যাটালগ নিয়ে আসেন।

দোকানে রিক্রি করতে গেলে লাভ খুব কম থাকে, তাছাড়া টাকাটা পেতে দেরী হয়। কিন্তু কারখানায যারা কাজ করছে তাদের মজুরি দেয়া হয় একটা কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথ। আর কারখানায় সরাসরি ক্রেতার কাছে বিক্রি করলে লাভ বেশী , টাকাও নগদ। দিনাজপুরের বাজারে ভারতীয় পোষাকের সাথে প্রতিযোগীতা করে বিক্রি করতে হয়। ঐগুলির কাপড়ের মান খারাপ, কিন্তু কালার কম্বিনেশন খুব ভাল। তাই সেগুলো ভাল বিক্রি হয়।

দিনাজপুরে ইমনের মত আরো কয়েকজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আছেন। তারাও ক্ষুদ্র আকারে পোষাক তৈরির কারখানা গড়ে তুলেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ইমনের চেয়ে অনেক আগে থেকে এই ব্যবসা করে আসছেন। তাদেরও একই রকম সমস্যা আছে, যার মধ্যে বাজারজাতকরণ অন্যতম। তাই ইমন তাদের কয়েকজনের সাথে আলোচনা করে একটি গ্রুপ গঠনের চেষ্টা চালান। তার উদ্দেশ্য ছিল, কয়েকজন উদ্যোক্তা সম্মিলিতভাবে বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নেয়া। ইমনের একার পক্ষে যেহেতু একটা দোকান কেনা সম্ভব নয়, তাই যদি কয়েকজন উদ্যোক্তা সম্মিলিতভাবে একটা বিক্রয় কেন্দ্র খোলা যায় তবে বিপননে আনেক সুবিধা হবে। তারা স্থানীয় কয়েকটি এনজিও'র সাথে যোগাযোগ করেন সহযোগীতার জন্যে। একটি এনজিও তাদের সহযোগীতায় এগিয়ে আসে। তারা একটি বিক্রয় কেন্দ্র খুলে দেয় তাদের দেয়া নামে। তারা বলে যে তাদের দেয়া পুনর্ভবা নামে তাদের সবাইকে পোষাক বিক্রি করতে হবে আর তাদের বিক্রয় কেন্দ্রের ভাড়া দিতে হবে। উদ্যোক্তারা সবাই রাজী হন। কিছুদিন বেশ ভালই ব্যবসা চলে। তারপর দেখা যায় গ্রুপের দুই একজন দাবী তোলেন যে তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানের আলাদা আলাদা নামে পোষাক বিক্রি করতে দিতে হবে। তাদের যুক্তি ছিল যে গ্রুপের অন্যদের চেয়ে তাদের পণ্যের মান ভাল, কিন্তু ক্রেতারা তাদের পণ্য আলাদা করে চিনতে পারছে না। তখন অন্যরা এতে আপত্তি জানায় । তারা বলে যে তাদের তৈরী পোষাকের মান কোনভাবেই নিম্ন মানের নয়। এই দ্বন্দের কারণে শেষ পর্যন্ত তাদের গ্রুপটি ভেঙ্গে যায়।

পুজির অভাবে ব্যাবসার প্রসার ঘটানো যাচ্ছে না যদিও যথেষ্ট ভাল নিপুন কারিগর আছে কিন্তু মেশিন কেনার বা দোকান কেনার মত আর্থিক সামর্থ ইমনের নেই। ঋণের জন্য তিনি কর্মসংস্থান ব্যাংকে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা বলেছে যে, বাড়ি বন্ধক রাখতে

হবে। তিনি এবং তার মা এতবড় ঝুকি নিতে রাজি নন। তাছাড়া বিকল্প হিসেবে তারা গহনা বন্ধক দিতে বলেছে। কিন্তু তাতেও ইমন ও তার বিধবা মা শংকা বোধ করেন।

তিনি আলফালাহ নামক একটি এনজিও থেকে মেশিন কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। সেটা সবেমাত্র শোধ হয়েছে। সেখানে ৬০০ টাকা সঞ্চয়ের পর তারা ১০ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছিল কোন বন্ধক ছাড়া। ইমনের শ্বশুরের একটা তৈরি পোষাকের দোকান আছে । তিনি বলেছেন যে, উৎপাদন বেশী করতে পারলে তখন তিনি তার দোকানে বিক্রির ব্যাবস্থা করে দেবেন। সেখানে যদিও ভারতীয় পোষাক থাকবে তবে তার চেয়ে কাপড়ের মান এবং দামের দিক দিয় ইমন এগিয়ে থাকবেন। আর ক্রেতাদের মধ্যে তার সুনাম আছে।

দিনাজপুরের বাজারে ভারতীয় পোষাকের সাথে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে হলে পোষাকের কালার কম্বিনেশনের উপর উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষন দেয়া জরুরী। ভারতীয় সূতী শাড়ির চাইতে আমাদের সূতী শাড়ির কাপড়ের মান ভাল তবে তাদের প্রিন্টের অনেক বেশী বৈচিত্র আছে আর কালার কম্বিনেশন ভাল। ইমন একবার ঢাকার গুলশানে এক দোকানে কাপড় দিয়েছিল কিন্তু তাদের পেমেন্ট পেতে অনেক দেরী হয় বলে আর দেয়নি। তবে ঢাকার বাজারেও তার কাপড়ের চাহিদা আছে বলে ঢাকার দোকান মালিক জানিয়েছিল, দরকার নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।